
সাহিত্য
বীথি

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education, as a Text Book on Bengali Text for Class VII for all Secondary Schools.
[Vide Notification No. 76|7|TB|129 dated 28.12.76.]

সাহিত্য বীথি

(দ্বিতীয় ভাগ)

[পরিমার্জিত সংস্করণ]

(সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

প্রবোধচন্দ্র সাহু, এম. এ.
প্রধান অধ্যাপক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য
বাগনান কলেজ ঃ হাওড়া

সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি
(পশ্চিম দিনাজপুর শাখা) কর্তৃক পরিমার্জিত

কনক প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১১৪ ডি, ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১০

প্রকাশ করেছেন ঃ
যূথিকা নায়ক, বি. এ.
কনক প্রকাশনী
১১৪ ডি, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১০

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৭৬
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৮
চতুর্থ মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮১
পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

গদ্যাংশ



বিশ্বম্ভরের বাল্যক্রীড়া

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর



পড়িয়া শুনিঞা সর্ব-শিশুগণ-সঙ্গে ।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে ॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী ।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি ॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে ।
অসংখ্যাত লোক একো-ঘাটে স্নান করে ॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ।
না জানি কতেক শিশু মিলে তাঁহি আসি ॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায়ে সন্তরে ।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥
জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর ।
সভার গা'য়েতে লাগে চরণের নীর ॥
সভে মানা করে তভো মানা নাহি মানে ।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক স্থানে ॥
পুনঃ পুনঃ সভারে করায় প্রভু স্নান ।
কারে ছুঁয়ে, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥
না পাইয়া নাগালী প্রভুর বিপ্রগণে ।
সভে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥
"শুন শুন ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব ।
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান ।"
কেহো বোলে "জল দিয়া ভাঙ্গে মোর
ধ্যান ।
কেহো বোলে "মোর শিবলিঙ্গ করে
চুরি ।"
কেহো বোলে "মোর লই পলায়
উত্তরী ॥"

কেহো বোলে "সন্ধ্যা করি জলেতে নাম্বিয়া।
ডুব দেই লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥"
কেহো বোলে "আমার না রহে সাজিধুতি।"
কেহো বোলে "আমার ফেলায় গীতা পুঁথি॥"
কেহো বোলে "পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥"
"স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অংগে।
যতেক চপল শিশু সব তার সংগে॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ।
নিত্য এইমত করে, কহিল তোমাত॥
দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে॥"

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি : শৈশবে বিশ্বম্ভর খুবই দুরন্ত ছিল। সে তার সমবয়সী শিশুদের সংগে মিলে স্নানরত ব্রাহ্মণদের ওপর নানাভাবে উপদ্রব করত। তারা তাই একদিন সকলে বিশ্বম্ভরের পিতার কাছে গিয়ে তার নানা রকম উপদ্রবের কথা জানালেন।

কবি পরিচিতি : ১৫১৮ খ্রস্টাব্দে কবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কুমারহট্টে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বৈকুণ্ঠদাস, মাতা নারায়ণী দেবী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে তিনি 'চৈতন্য ভাগবত' লেখেন। এটি আদিখণ্ডের অন্তর্গত।

শব্দার্থ : শুনিঞা—শুনিয়া। কুতুহলী—উৎসুক, কৌতূহলী। সভারে—সকলকে। কুল্লোল—কুলকুচি। বিপ্রগণে—ব্রাহ্মণেরা সকলে। জনকের স্থানে—পিতার নিকটে। বোলে—বলে। কেমতে—কিভাবে।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। বিশ্বম্ভর কাদের সংগে মিলে স্নান করত? স্নান করার সময় সে তার সংগীদের নিয়ে কিভাবে জলকেলিতে মত্ত থাকত?

২। ব্রাহ্মণেরা বিশ্বম্ভরের পিতার নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানিয়েছিল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"জল-ক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।"**
—(ক) কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) কবি কে ? (গ) জল-ক্রীড়া কি ? (ঘ) 'গৌর সুন্দর-শরীর'—বলতে কি বোঝান হয়েছে ?

২। **"পরম বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ।**
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত ॥"
—(ক) কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) কবি কে ? (গ) 'নিত্য এই মত' কে কি করে ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **অর্থ পার্থক্য লেখ**—পঢ় ও পড়, সবে ও সভে, বোল ও বল, নীর ও নীড়।
২। **গদ্যরূপ লেখ**—লণ্ডিয়া, কুতুহলী, সন্তরে, নাম্বিয়া, এইমত, মোর।
৩। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর**—সন্ন্যাসী, পুত্র, বান্ধব, সুন্দর।
৪। **পদ পরিবর্তন কর**—শিশু, শান্ত, শরীর, স্নান, জল, দেহ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বিশ্বম্ভর কার নাম ছিল ? পরে তিনি কি নামে পরিচিত হয়েছিলেন ?
২। জগন্নাথ মিশ্র কে ছিলেন ?
৩। সাজিধুতি কাকে বলে ?
৪। গীতা কি ?
৫। নদীয়া জেলার কোথায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন ?

গুরুদক্ষিণা

কাশীরাম দাস



হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষাহেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।
দ্রোণাচার্য-মুখে বাক্য নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা-বল্ক-পরিধান, ফল-মূলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণমূর্তি করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব অস্ত্র শিখি হৈল মহাধনুর্ধর॥
তবে কতদিন পরে কৌরব-নন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা-পুত্তলী আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥

কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিল যে ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে স্তম্ভবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্ময় হইয়া॥
এ হেন অদ্ভুতকর্ম কভু নাহি শুনি।
বহু বিদ্যা জানি হেন বিদ্যা নাহি জানি॥
অনুচরে লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃসর ধরি॥
জিজ্ঞাসিল, হও তুমি কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মচারী বলে, মম একলব্য নাম।
দ্রোণ-গুরুস্থানে অস্ত্র-শিক্ষা করিলাম॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তরে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে করিলেন সব নিবেদন॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে নিগ্রহ কর বুঝিনু এখন॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা, শিখাইলে নিষাদ-কুমারে॥

অর্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিলা বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়॥
দ্রোণ আর অর্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি ধীরে উঠি নিষাদ-নন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদ-নন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন্ প্রয়োজন॥

দ্রোণ বলিলেন, যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা মোর পাশে॥

এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করিব বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার ॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অংগীকার ॥
দ্রোণ বলিলেন, যদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অংগুলিটা দিবে ॥
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল।
ততক্ষণে কাটিয়া অংগুলি গোটা দিল ॥

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সঞ্চয়

বিষয় পরিচিতি : ব্যাধ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে চায়। কিন্তু নীচু জাতে জন্ম বলে দ্রোণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন একলব্য দ্রোণের মাটির মূর্তি নির্মাণ করে পরম নিষ্ঠার সংগে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষায় মগ্ন থাকেন। একদিন একটি কুকুর তাঁর ধ্যান ভংগ করায় তিনি শব্দভেদী বাণ মেরে তার মুখ বন্ধ করে দেন। তখন পাণ্ডব ও কৌরবেরা দ্রোণের সংগে মৃগয়ারত ছিলেন। অর্জুন একলব্যের নিকটে গিয়ে তাঁর পরিচয় পান। দেখতে পান দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি। একলব্য নিজেকে তাঁর শিষ্য বলে পরিচয় দেন। ঈর্ষান্বিত অর্জুন দ্রোণের নিকটে একলব্যের বৃত্তান্ত বিবৃত করে তাঁর ক্ষোভের কথা জানান। পরে দ্রোণ একলব্যের নিকটে গিয়ে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাংগুলিটি কেটে দিতে বলেন। কালাবিলম্ব না করে একলব্য গুরুর আদেশ পালন করেন।

কবি পরিচিতি : সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি কাশীরাম দাশের জন্ম। জন্মস্থান সিংগি গ্রাম, বর্ধমান। পিতার নাম কমলাকান্ত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাসদেবের মহাভারতের কয়েকটি পর্বের বংগানুবাদ করেন। পদ্যাংশটি কাশীদাসী মহাভারতের 'আদিপর্বের' অন্তর্গত।

শব্দার্থ : চরণে—পায়ে। অখ্যাতি—দুর্নাম। নিষাদ—ব্যাধ। স্তব্ধ বাণ—শব্দভেদী বাণ। অদ্ভুতকর্ম—বিস্ময়কর কাজ। মৃগয়া—পশু শিকার। অগোচর—অজ্ঞাত। ততক্ষণে—সেই মুহূর্তে।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। একলব্যের গুরুদক্ষিণা দানের বিষয় সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। এই কবিতায় গুরু দ্রোণ ও শিষ্য একলব্যের কি কি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাও ? অর্জুন ও একলব্যের মধ্যে কাকে তোমার ভাল লাগে ? কেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"না মারিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।**
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা ॥"

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) প্রসঙ্গ কি?
(ঘ) কে, কেন ও কিভাবে কুকুরের 'রা' রুধেছিল?

২। **"ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয় ॥"**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) কে, কেন নিঃশব্দে চিন্তা করছিলেন?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **'তুই হোস্ নীচ জাতি।"**

—(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কে কাকে উদ্দেশ্য করে এরূপ উক্তি করেছিল?

২। **"পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।**
হেন বিদ্যা, শিখাইলে নিষাদ-কুমারে ॥"

—(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কে কাকে এরূপ বলেছিলেন? (গ) সেখানে কোন্ বিদ্যার উল্লেখ করা হয়েছে? (ঘ) 'নিষাদ' কুমারটি কে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। একলব্যের পরিচয় কি?
২। দ্রোণাচার্য কাদের গুরু ছিলেন?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ**—প্রবেশিল, আইলাম, করয়ে, শিখি হৈল, বসিয়াছে।
২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ**—নীচ, অখ্যাতি, বিনয়,পাছে পাছে, বিদ্যা ॥
৩। **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর** (রেখাঙ্কিত পদগুলির) ঃ

(ক) শিক্ষাহেতু আইলাম তোমার <u>সদন</u>। (খ) <u>সর্বঅস্ত্র</u> শিখি হৈল মহাধনুর্ধর। (গ) সেই বনে গেল <u>মৃগয়া</u> কারণ। (ঘ) পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর <u>নরে</u>। (ঙ) <u>দ্রোণে</u> দেখি ধীরে উঠি নিষাদ-নন্দন।

৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ**—দ্রোণাচার্য, মূলাহারী, ধনুর্ধর, অধ্যয়ন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। মৃগয়া বলতে কি বোঝ?
২। নিষাদ-নন্দন কে?
৩। দ্রোণ কেন একলব্যকে অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে চাননি?
৪। পার্থ কে?
৫। একলব্যের কাছে দ্রোণ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ কি চেয়েছিলেন?





দেবীর আদেশে কালী শেষভাগ রাতি।
সাতালি পর্বতে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি॥
বিধির কৌতুক-কথা জানে কোন জন।
মরা জীয়ে যদি থাকে কপালে লিখন॥
বেহুলা রন্ধন করি ওলাইল ভাত।
"উঠিয়া ভোজন কর, শুন প্রাণনাথ॥"
কালনিদ্রা পায় তারে দেবীর কৃপায়।
ঢুলিতে ঢুলিতে রামা প্রভুরে জাগায়॥
ধন্বন্তরী বেজী শিখী কংক কুরল।
দেবীর কৃপায় হৈল নিদ্রায় বিহ্বল॥
খসিল অংগার-গুঁড়ি কালিনী-নিঃশ্বাসে।
সুতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে॥
বাসরে প্রবেশ করে এ কালনাগিনী।
বেহুলা লখাইরূপ দেখিল আপনি॥
"এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল
বলিব॥
বিষম আরতি দেবী দিলা মোর তরে।
লখীন্দরে খাইতে মোর সর্ত নাহি
পুরে॥
ছ'কুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী।
তে কারণে সুখদুঃখ হৃদয়েতে জানি।"
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে।
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে॥
হেনকালে পাশমোড়া দিতে লখীন্দর।
পদাঘাত বাজে তার দন্তের উপর॥
তখন উঠিয়া কালী কহে সত্য কথা।

"চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা ॥
মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনি অপরাধে মোর দন্তে মারে লাথি ॥
বিষদন্ত দিয়া কালী দংশে তার পায়।
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায় ॥
"জাগ জাগ, বেহুলা, সায় বান্যার ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি ॥
বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি।
সাপিনীরে ফেল্যা মারে সুবর্ণের জাঁতি ॥
পুচ্ছকাটা গেল তার আড়াই আঙ্গুল।
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল ॥
বাঁধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতার আঁচলে।
ব্যগ্র হইয়া বেহুলা প্রভুরে করে কোলে ॥
"শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া ॥"
প্রভু কোলে করি কান্দে লোহার বাসরে।
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে ॥

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ সাঁতালী পর্বতের ওপরে লখীন্দর-বেহুলার বাসর ঘর। মাঝরাতে কালনাগিনী মনসার আদেশে অঙ্গার-গুঁড়ি সরিয়ে সেখানে প্রবেশ করে। লখীন্দর তখন নিদ্রামগ্ন—বেহুলা তন্দ্রাচ্ছন্ন। লখিন্দরের পা কালনাগিনীর গায়ে লাগলে সে তাকে দংশন করে। তার আর্তনাদে বেহুলা জেগে ওঠে। হাতের সোনার জাঁতি ছুঁড়ে মারলে কালনাগিনীর আড়াই আঙ্গুল পুচ্ছ কাটা যায়। বেহুলা সেটা তার আঁচলে বেঁধে রাখে। তারপর পতিশোকে সে কাতরস্বরে বিলাপ করতে থাকে।

কবি পরিচিতি ঃ ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ শতকের কবি। জন্মস্থান কাঁদড়াগ্রাম, বর্ধমান। পিতার নাম শঙ্কর মন্ডল। ইনি মনসাকে কেতকা বলেছেন। তাই নিজেকে কেতকার দাস বা মনসার দাস বলে উল্লেখ করেছেন। রচনাটি তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য হতে গৃহীত।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। লখীন্দরের বাসর ঘরের বর্ণনা দাও।

২। লখীন্দরের কিভাবে সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটেছিল ?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। "উঠিয়া ভোজন কর, শুন প্রাণনাথ ॥"
—(ক) কার লেখা কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) উক্তিটি কার ? (গ) বক্তা 'প্রাণনাথ' বলে কাকে সম্বোধন করেছেন ?

২। "জাগ জাগ, বেহুলা, সায় বান্যার ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি ॥"
(ক) কার লেখা কোন্ কবিতায় উদ্ধৃতিটি আছে ? (খ) কে, কখন এই উক্তি করেছিল ? (গ) 'সায় বান্যার ঝি' কথাটির অর্থ কি ?

৩। "চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হৈও যতেক দেবতা।"
(ক) কোন্ কবিতায় এই কথাটি আছে ? (খ) কে, কখন ও কেন এরূপ উক্তি করেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কালনাগিনী কখন ও কার আদেশে সাতালি পর্বতে গিয়েছিল ?

২। লখীন্দরকে কালনাগিনীর দংশনের পরে বেহুলা কি করেছিল ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর** :—দেবী, কালনাগিনী, সর্প, সুন্দর, মাতা, শ্বশুর, অভাগিনী।

২। **গদ্যরূপ লেখ** :—রাতি, উঠিয়া, হেন, মোর, তিতিল, হেনকালে, লাগিয়া।

৩। **প্রতিটি শব্দের অন্ততপক্ষে চারটি করে প্রতিশব্দ লেখ** :—পর্বত, খাতা, সূর্য, জল, চন্দ্র ও রজনী।

৪। **নীচের রেখাঙ্কিত শব্দগুলির পদ নির্দেশ কর** :—

(ক) <u>আপনি</u> তিতিল কালী লোচনের জলে।

(খ) সাতালি পর্বতে গিয়া উঠে <u>শীঘ্রগতি</u>।

(গ) দেবীর কৃপায় হৈল <u>নিদ্রায়</u> বিহ্বল।

(ঘ) লখীন্দরে <u>খাইতে</u> মোর সর্ত নাহি পুরে।

(ঙ) <u>ছ'কুড়ি</u> নাগের মাতা এ কালনাগিনী।

(চ) <u>এহেন</u> সুন্দর গায় কোনখানে খাব।

মৌখিক প্রশ্ন

১। লখীন্দরকে বাসর ঘরে দংশন করতে কে কালনাগিনী পাঠিয়েছিল ?

২। 'সায় বান্যার ঝি' কে ?

৩। বেহুলার শ্বশুর কে ছিলেন ?

৪। কালনাগিনী কেন ব্যাথায় আকুল হয়েছিল ?

৫। কোতকাদাস কথাটির অর্থ কি ?



নানান্ দেশের নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ ঃ দেশ-বিদেশে বহু ভাষা থাকা সত্বেও মাতৃভাষার সমতুল্য আর কিছুই হয় না। চাতক পাখীর বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জলে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। সেরূপ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায় না।

কবি-পরিচিতি ঃ টপ্পাকার রামনিধি গুপ্ত ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ি ছিল ত্রিবেণীর নিকট চাপড়া গ্রামে। তিনি নিধুবাবু নামে সবিশেষ বিখ্যাত। তাঁর রচিত টপ্পা গানগুলির মধ্যে এটি একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় রচনা।

শব্দার্থ ঃ নানান্—বিভিন্ন। স্বদেশীয়—স্বদেশ সম্বন্ধীয়। সরোবর—জলাশয়। চাতকীর—চাতক পাখীর।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। মাতৃভাষা কাকে বলে? আমাদের মাতৃভাষার জন্ম কোথা হতে? মাতৃভাষাকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে তুলেছেন এমন চারজন কবি ও লেখকের নাম লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। "কত নদী সরোবর……তৃষা ?" —(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা, কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? (খ) প্রসঙ্গ কি ? (গ) মূল ভাব ব্যক্ত কর।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। ধারা জল ও জলধারা কথা দুটির অর্থ পার্থক্য নির্দেশ কর।
২। নীচের রেখাঙ্কিত শব্দগুলির পদ নির্দেশ কর ঃ
(ক) <u>নানান্</u> দেশের নানান্ <u>ভাষা</u>
(খ) <u>বিনা স্বদেশীয়</u> ভাষা
(গ) <u>ঘুচে</u> কি <u>তৃষা</u>

মৌখিক প্রশ্ন

১। তোমার জানা কয়েকটি ভাষার নামোল্লেখ কর।
২। নদী সরোবরের চেয়েও বৃহত্তম জলাশয় কি ?
৩। চাতকীর কখন তৃষ্ণা নিবৃত্তি ঘটে ?



খল ও নিন্দুক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

মহৎ যে হয় তার সাধু-ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই।
শারী আর শুকপাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক
পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজংগ অমৃত খেয়ে গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ ঃ মহৎ, উপকারী, গুণবান, সাধু ও সুজন ব্যক্তিরা সর্বদা ভালো আচরণ করে। কিন্তু কুজন, গুণহীন, মিথ্যাবাদী, ঈর্ষাতুর ব্যক্তিরা সর্বদা অন্যের অনিষ্ট সাধনের কথা ভাবে।

কবি পরিচিতি ঃ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিণারায়ণ, মাতা শ্রীমতী দেবী। তিনি বিখ্যাত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশপ্রেম, নীতি ও আদর্শ বিষয়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। 'খল ও নিন্দুক' কবিতাটি তাঁর 'রসলহরী' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তভুর্ক্ত।

শব্দার্থ ঃ মহৎ—সজ্জন। কুঠার—কুড়াল। সুবাস—সুগন্ধ। সুমধুর—খুব মিষ্টি। ভুজঙ্গ—সাপ। গরল—বিষ। জলধর—মেঘ।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। খল ও নিন্দুকের ব্যবহার সম্পর্কে কবি যা বলেছেন সেটা আলোচনা কর।

২। নিন্দুক আমাদের কি উপকার করে থাকে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **দেখ হে কুঠার.........বিতরণ।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? (খ) কবি কে? (গ) মূল ভাবটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। **লবণ-জলধি-জল.........বরিষণ।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) জলধর কিভাবে সুধা বর্ষণ করে।

৩। **সুজনে সুযশ.........সুরের নাশিয়া।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত? (খ) কবি কে? (গ) মূল ভাবটি নিজের ভাষায় লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কাকের রবে কানে বিষ লাগে কেন?

২। কোকিলের 'অখিলপ্রিয়' হবার কারণ কি?

৩। অধম রতন পেলে কি করে ?

৪। উপদেশে সাধু খল হয় না কেন ?

বস্তুমুখী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) — করেনি কারে ধন বিতরণ।

(খ) গুণহীনে — কোনখানে নাই।

(গ) উপদেশে কখন কি সাধু হয় — ?

(ঘ) — অমৃত খেয়ে গরল উগরে ॥

২। জলধর শব্দের অনুসরণে পাঁচটি শব্দ গঠন কর। যেমন—হলধর।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ**—উপকার, বিতরণ, হরণ, সম্পদ, সমাদর, গরল।

২। **পদান্তর কর ঃ**—মহৎ, সম্পদ, ধন, কঠোর, সাধু, দোষ, গুণ, জল।

৩। **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্দেশ কর ঃ**

(ক) <u>অধমে</u> রতন পেলে কি হইবে ফল।

(খ) <u>সুজনে</u> সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।

(গ) <u>কুজনে</u> কুরব করে সুরব নাশিয়া।

মৌখিক প্রশ্ন

১। খল ও নিন্দুক কবিতায় কি কি পাখীর নামোল্লেখ করা হয়েছে ?

২। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচজন সুজনের নাম কর।

৩। অমৃত কাকে বলে ?

৪। ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে কি উগরায় ?

৫। কুজনে সুরব নাশ করে কি দিয়ে ?



স্বাধীনতা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পারিবে পায় হে,
কে পারিবে পায়॥
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহু বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সঙ্কেত

ভাবার্থ : স্বাধীনতায় স্বর্গসুখ মেলে। অন্যের অধীন হয়ে থাকা নারকীয় যন্ত্রনাতুল্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানও গৌরবের।

কবি পরিচিতি : কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের কাঁকুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ও সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' থেকে কবিতাংশটি আহৃত।

শব্দার্থ : স্বাধীনতা—অন্যের অধীনতা মুক্ত। শৃঙ্খল—বন্ধন। ভেরী—রণবাদ্য যন্ত্র বিশেষ। বাহুবল—শক্তি। রণভূমে—যুদ্ধক্ষেত্রে। দেশহিতে—দেশের কল্যাণের জন্য। ত্বরা—শীঘ্র।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ? স্বাধীনতা হীনতা কথার অর্থ কি?

২। 'স্বাধীনতা' কবিতায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেমের যে পরিচয় পেয়েছ সেটা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **কোটি-কল্প দাস.........স্বর্গ-সুখ তায়।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) স্বর্গ ও নরক বলতে কবি কি নির্দেশ করতে চেয়েছেন?

২। **দেশ হিতে মরে.........তুল্য তার নাই।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? (খ) কবি কে? (গ) অংশটির মূল ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। দাসত্ব শৃঙ্খল কিসের তুল্য? ২। কার জীবন সার্থক?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর :** স্বাধীনতা, দাসত্ব, শৃঙ্খল, সার্থক জীবন।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর :** স্বাধীনতা, দিনেক, উদ্ধার।

৩। **বাক্য রচনা কর :** কোটি-কল্প, দাসত্ব-শৃঙ্খল, স্বর্গ-সুখ, বাহুবল।

৪। **নীচের রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :**

(ক) আত্মনাশে সেই করে দেশের উদ্ধার হে,

(খ) রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,

(গ) দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,

মৌখিক প্রশ্ন

১। ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা লাভ করেছে? ২। দেশহিতে মরেছেন এমন তিন জন শহীদের নাম বল। ৩। ভেরী কখন বাজান হয়?

৪। রণভূমে কি হয়?



রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ;
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ : সুদূর প্রবাসে থেকে কবি তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে স্মরণ করছেন। সেখানে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটতে পারে। কবি জীবনে হয়ত-বা অনেক ভুলত্রুটি করেছেন। সব কিছু দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেশজননী যদি তাকে মনে রাখেন তবেই তাঁর জীবন সার্থক হবে।

কবি পরিচিতি : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। 'বঙ্গভূমির প্রতি' তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গীতি কবিতা।

শব্দার্থ : মিনতি—প্রার্থনা। সাধ—আকাঙ্ক্ষা। পরমাদ—দোষ। কোকনদ—পদ্মফুল। নীর—জল। সর্বজন—সবলোক। অমরতা—মৃত্যুর পরেও স্মরণীয় হয়ে থাকা। জন্মদে—জন্মদাত্রী।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। "বঙ্গ ভূমির প্রতি" কবিতায় কবির মনোবেদনা ও আক্ষেপের যে প্রচ্ছন্ন সুর শোনা যায় তার কারণ কি?

২। "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতায় কবির স্বদেশপ্রীতির যে পরিচয় পাও তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"জন্মিলে মরিতে……জীবন নদে?"**
—(ক) উদ্ধৃতিটি কোন কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) অংশটির মূল ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

২। **মক্ষিকা গলে না……অমৃত-হ্রদে।**
—(ক) কোন্ কবিতা হতে অংশটি উদ্ধৃত? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির সরল অর্থ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কবি মনের সাথে কিসের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন?

২। 'জীব-তারা' বলতে কবি কি নির্দেশ করতে চেয়েছেন?

৩। কবি দেহের সাথে কার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর :** মা, দাস, নদ, শ্যামা, নরকুলে, অমর।

২। **অর্থের পার্থক্য দেখাও :** নীর ও নীড় ; কূলে ও কুলে।

৩। **গদ্যরূপ লেখ :** সাধিতে, জন্মিলে, নাহি ভুলে, যাচিব।

৪। **"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"**

—কবি 'মধুহীন' ও 'কোকনদ' শব্দ দুটি কি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন ?

৫। **বাক্য গঠন কর :** মধুহীন ; দেহ-আকাশ, চিরস্থির, অমৃত-হ্রদ, সর্বজন, অমরতা।

মৌখিক প্রশ্ন

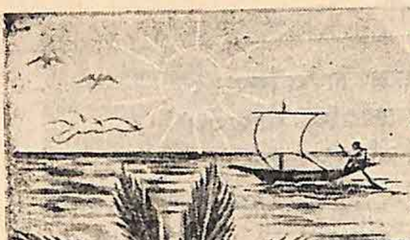
১। অমৃত-হ্রদ কি ?

২। কবি জীবন-নদ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

৩। প্রবাসী কাদের বলে ?

৪। "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতায় কোন্ কোন্ ঋতুর উল্লেখ আছে ?

৫। "মনের মন্দির" বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?



সুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরলকল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো। গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন
করিছে কৌতুকালাপ। উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর। বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার—

স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ এক মেঘমুক্ত প্রসন্নদিনে কবি পদ্মার ওপরে বোটে বসে দেখছেন নদীতটে গ্রাম, কুটির ও গাছপালা। গ্রামবধূগণ স্নান করতে গিয়ে কৌতুকালাপে মাতে। বৃদ্ধ জেলে নৌকায় বসে মাথা নীচু করে জাল বোনে। উলঙ্গ বালকেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। তারা আনন্দে উৎফুল্ল। পদ্মা যেন স্নেহময়ী জননী। নির্বিচারে সকলেরই স্নেহ-জ্বালাতন সহ্য করে। নদীতটের ওপরে সুদূর বিস্তৃত নীলাকাশ। স্থির শান্ত নদীর জল। এখানেই মেলে অপার সুখ ও শান্তি।

কবি পরিচিতি ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। 'সুখ' একটি প্রকৃতি বর্ণনামূলক কবিতা। এটি তাঁর 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ মেঘমুক্ত—মেঘশূন্য। প্রসন্ন—আনন্দিত। বক্ষে—বুকে। কল্লোল—ঢেউ। অর্ধমগ্ন—অর্ধেক ডুবে আছে এমন। ঘনছায়া পূর্ণ—গভীর ছায়ায় ভরা। শস্যক্ষেত্র—ধানের ক্ষেত। কৌতুকালাপ—হাস্যকর বিষয়ের আলোচনা। নতশির করি—মাথা নীচু করে। নীলাম্বর—নীল আকাশ।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'সুখ' কবিতায় পল্লীপ্রকৃতির যে বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায় তার আলোচনা কর।

২। 'সুখ' কবিতা অবলম্বনে পদ্মা নদী সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা জন্মেছে সেটা ব্যক্ত কর।

৩। 'সুখ' কবিতার বর্ণনা কোন্ ঋতু ও কোন সময়ের বলে মনে হয়? তখন প্রকৃতির অবস্থা কেমন থাকে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **অর্ধমগ্ন বালুচর……পোহাইছে শুয়ে।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য নিজের ভাষায় লেখ?

২। ধৈর্যময়ী মাতার মতন……স্নেহ-জ্বালাতন।

(ক) কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) কবি কে ? (গ) ধৈর্যময়ী মাতা কে ? (ঘ) তিনি কার জ্বালাতন সহ্য করছেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। গ্রাম্যবধূরা স্নান করার সময় কি করে ?

২। নদীর দুই তীরে কি কি আছে ?

৩। জেলেরা নৌকায় বসে কি বোনে ?

৪। উলঙ্গ বালকেরা কি ভাবে নদীতে স্নান করে ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। গদ্যরূপ লেখ ঃ আজি, হাসিছে, ভাসায়ে, পশিতেছে, পোহাইছে।

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ তৃষ্ণার্ত, কৌতুকালাপ, বারম্বার, নির্মল, নীলাম্বর, নীলাভ্র।

৩। প্রতিটি শব্দদ্বারা একটি করে বাক্য রচনা কর ঃ মেঘমুক্ত, বালুচর, শস্যক্ষেত্র, নতশির, নীলাম্বর, জলকলস্বরে।

৪। পদ পরিবর্তন কর ঃ আকাশ, মুখ, গ্রাম, বক্র, স্নেহ, শান্ত, জল।

৫। বিপরীত শব্দ লেখ ঃ প্রসন্ন, সুন্দর, শীর্ণ, উচ্চ, মিষ্ট, আনন্দ, স্থির।

মৌখিক প্রশ্ন

১। পদ্মার মত দুটি বড় নদীর নাম কর।

২। তরী বলতে কি বোঝায় ?

৩। পদ্মা কোন্ ঋতুতে প্রশান্ত থাকে ?

৪। পদ্মাতীরের তরুগুলি কেমন ?

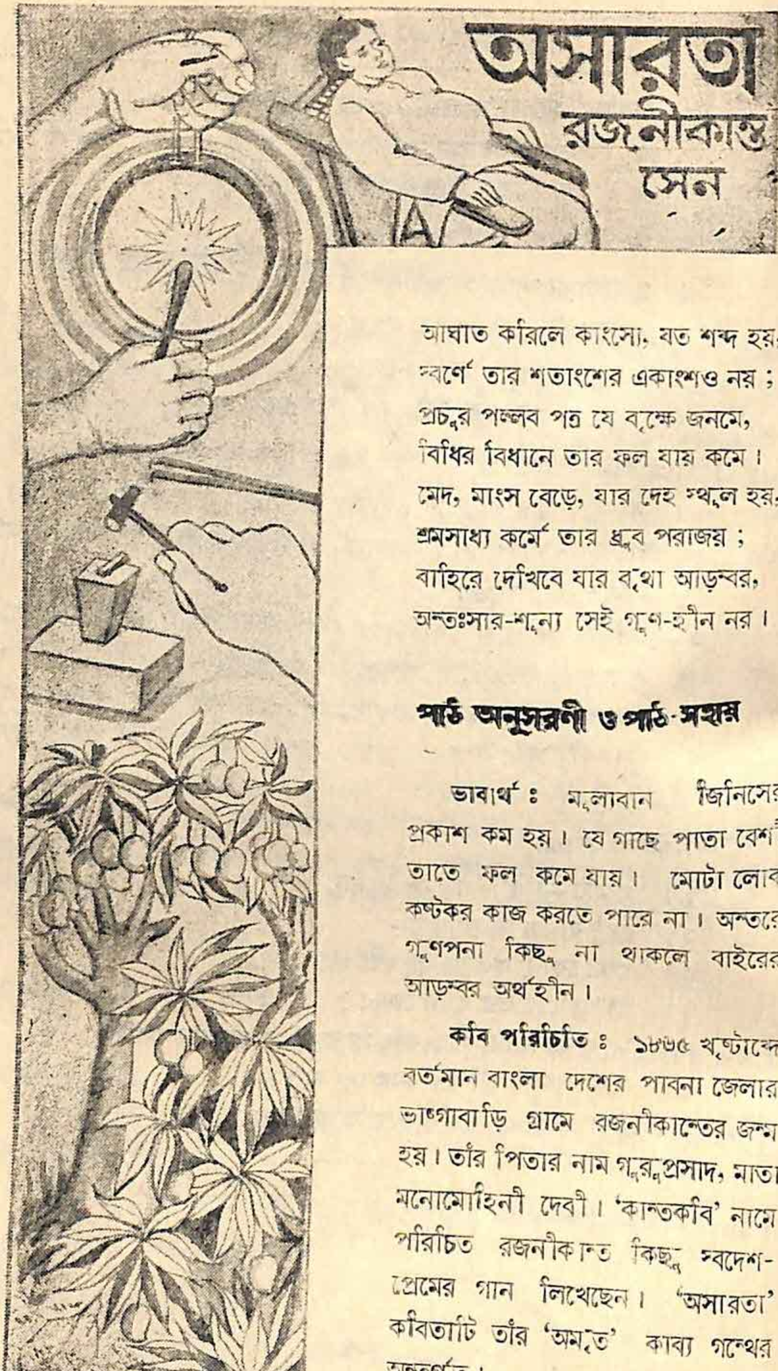
৫। 'সুখ' কবিতাটি পড়ে কবি সম্পর্কে কি ধারণা জন্মায় ?

৬। কারা পদ্মায় ঝাঁপিয়ে কলহাস্য করে ?

৭। কারা স্নান করতে গিয়ে কৌতুকালাপে মাতে ?

অসারতা

রজনীকান্ত সেন



আঘাত করিলে কাংস্য যত শব্দ হয়,
স্বর্ণে তার শতাংশের একাংশও নয় ;
প্রচুর পল্লব পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
বিধির বিধানে তার ফল যায় কমে।
মেদ, মাংস বেড়ে, যার দেহ স্থূল হয়,
শ্রমসাধ্য কর্মে তার ধ্রুব পরাজয় ;
বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণ-হীন নর।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ ঃ মূল্যবান জিনিসের প্রকাশ কম হয়। যে গাছে পাতা বেশী তাতে ফল কমে যায়। মোটা লোক কষ্টকর কাজ করতে পারে না। অন্তরে গুণপনা কিছু না থাকলে বাইরের আড়ম্বর অর্থহীন।

কবি পরিচিতি ঃ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বাংলা দেশের পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম গুরুপ্রসাদ, মাতা মনোমোহিনী দেবী। 'কান্তকবি' নামে পরিচিত রজনীকান্ত কিছু স্বদেশ-প্রেমের গান লিখেছেন। 'অসারতা' কবিতাটি তাঁর 'অমৃত' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ কাংস্য—কাসা। বিধির—অদৃষ্টের। বিধান—নিয়তি। শ্রমসাধ্য—যে কাজ করতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। মেদ—চর্বি। স্থূল—মোটা। ধ্রুব—নিশ্চিত।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। অসারতা কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লেখ।

২। প্রচুর শব্দ, পল্লব, মেদ ও আড়ম্বর দেখে কি মনে হয়?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **বাহিরে দেখিবে.........গুণ-হীন নর।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) নিগুণ ও গুণী লোকের কি কি লক্ষণ দেখা যায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কোন্ ধাতুতে আঘাত করলে বেশি শব্দ হয়?

২। কোন্ গাছে ফল কম জন্মায়?

৩। শ্রমসাধ্য কাজে কোন্ শ্রেণীর লোকের পরাজয় হয়?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **বিপরীত শব্দ লেখ** ঃ আঘাত, শব্দ, কমে, পরাজয়, আড়ম্বর, গুণ-হীন।

২। **বাক্য গঠন কর** ঃ শতাংশের একাংশ, শ্রমসাধ্য, আড়ম্বর, অন্তঃসার-শূন্য, ধ্রুব।

৩। **পদ পরিবর্তন কর** ঃ পল্লব, দেহ, স্থূল, মাংস, পরাজয়, বিধি, ফল।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কোন্ ধাতু বেশি মূল্যবান—সোনা না তামা?

২। কয়েকটি অধিক ফলবতী বৃক্ষের নাম কর।

৩। শ্রমসাধ্য কাজ যারা করে তাদের কি বলে?

৪। কয়েকজন গুণবান ব্যক্তির নাম কর।



পূজা

অতুলপ্রসাদ সেন



নিচুর কাছে হতে নিচু শিখলি না রে মন।
সুখী জনের করিস পূজা, দুঃখীর অযতন—মূঢ় মন।
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন—মূঢ় মন।
প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই তো মহাজন—মূঢ় মন!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরমতীর্থ দীনের শ্রীচরণ—মূঢ় মন!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য;
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ—মূঢ় মন!

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ : মন বড়ই নির্বোধ। সুখীজনের পরিবর্তে দুঃখীজনের পূজা করা উচিত। সকল মানুষকে ভালবাসাতেই জীবনের সার্থকতা। সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই আছেন। দেবতাজ্ঞানে দীন-দরিদ্রের প্রতি অকাতরে সেবা করাই ঈশ্বর-পূজার প্রকৃষ্ট পন্থা।

কবি-পরিচিতি : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় অতুলপ্রসাদের জন্ম। আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার মগরা গ্রাম। তিনি বহু উৎকৃষ্ট গান রচনা করেছেন। এই গানটি তাঁর 'কাকলি' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত।

শব্দার্থ : অযতন—অযত্ন। মূঢ়—নির্বোধ। চরণ—পা। অধিক—বেশী। মহাজন—মহৎব্যক্তি। কৃচ্ছ্রসাধন—কঠোর দৈহিক কষ্ট স্বীকার, আত্মনিপীড়ন।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রকৃত পূজা কি? বর্তমানকালের পূজা-পদ্ধতি ও কবির ব্যক্ত পূজার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয়?

২। কবি মনকে মূঢ় বলেছেন কেন? কবির মতে শ্রেষ্ঠ পূজা কি?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"প্রেমধন মায়ের·········অধিক যতন,"**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) প্রেমধন বলতে কবি কি নির্দেশ করতে চেয়েছেন?

২। **সকল ঘরে সকল·········মূঢ় মন।**

(ক) কোন্ কবিতা থেকে গৃহীত? (খ) কবি কে? (গ) কবির মতে মহাজন কে? (ঘ) নারায়ণের অধিষ্ঠান কোথায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। মূঢ় মন কার পূজা করে ও কার অযত্ন করে থাকে?

২। কৃচ্ছ্রসাধন কথাটির অর্থ কি?

৪। মহাজন কে?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** নিচু, ধনী, সরল, দুঃখী, শ্রেষ্ঠ।

২। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** পূজা, সুখী, মূঢ়, ধনী, দীন, মত্ত।

৩। **বাক্য গঠন কর ঃ** চরণ-ধূলি, প্রেমধন, মহাজন, কৃচ্ছ্রসাধন, মতামত, পরমতীর্থ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। চন্দন কোথায় পাওয়া যায়?

২। প্রেমধন কিসের মতন?

৩। পরমতীর্থ কি?

৪। নারায়ণ কে?

৫। মন কিসে মত্ত থাকে?



ফুলের ভাষা

প্রিয়ম্বদা দেবী

রাঙা গোলাপের ফুল
হাসি মুখে বলে
"হও নম্র, শুচি ও সুন্দর।"
সুসিত কমলগুলি
সরসীর জলে
বলে, "হও ক্রমে শুভ্রতর।"
কনক-বরণ দীপ্ত
ওই সূর্যমুখী
চেয়ে ঊর্ধ্বে নির্মল তপনে
বলে, "উচ্চে লক্ষ্য রাখ,
প্রেমে হও সুখী
ধৈর্য ধর জীবনে মরণে।"
যূথিকার কলি বলে,
"প্রীতি কর দান
ক্ষুদ্র হও, হ'য়োনা কৃপণ।"
শেফালী হাসিয়া বলে
প্রফুল্ল-বয়ান,
"হিমবায় র'বে কতক্ষণ ?"
এমনি কত না ফুল
প্রতি দিন-রাতে
হাসিমুখে বলে কত কথা,
সবারে মিলায়ে যদি
ভাবি এক সাথে
পাই তবে দেবের বারতা।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

ভাবার্থ : ফুলেরা আমাদের অনেক কিছু শেখায়। তারা দৈব বাণী বয়ে আনে। রাঙা গোলাপ শুচি ও সুন্দর হতে বলে। পদ্ম শেখায় শুভ্রতর হতে। ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত ও প্রীতি দান করতে শেখায় সূর্যমুখী ও যূথিকা ফুল। শেফালী ফুল যেন হিমে থাকতে নিষেধ করে। সব ফুলের কথা যদি একসঙ্গে ভাবি তবেই আমরা দেবতার কথা বুঝতে পারি।

কবি পরিচিতি ঃ ১৮৭১ খৃস্টাব্দে পাবনা জেলার গুনাইগাছা গ্রামে মহিলা-কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর জন্ম হয়। পিতার নাম কৃষ্ণকুমার বাগচি, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। 'রেণু', 'তারা', 'পত্রলেখা', ইত্যাদি তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ঃ শুচি—পবিত্র। শুভ্রতর—আরও সাদা। প্রীতি—ভালবাসা। প্রফুল্ল-বয়ান—হাসিমুখ। সবারে—সকলকে। দেবের—দেবতার। বারতা—সংবাদ।

অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ফুলের কাছ থেকে আমরা কি কি শিক্ষা পাই?

২। কবি কেন বলেছেন ফুলের কথাই দেবতার কথা?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **সবারে মিলায়ে……দেবের বারতা।**
(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) দেবের বারতা কি?

২। **উচ্চে লক্ষ্য রাখ……জীবনে মরণে।**
(ক) কোন্ কবিতার অন্তর্গত? (খ) কবির নাম কি? (গ) উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। রাঙা গোলাপ হাসিমুখে কি বলে?

২। সূর্যমুখী ফুল কি বলে?

৩। যূথিকার কলি কি কি বলে?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** রাঙা, সুন্দর, মরণ, কৃপণ, দেব।

২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** শুচি, হাসি, উর্ধ্বে, জীবন, কৃপন, প্রফুল্ল।

৩। **পাঁচটি করে প্রতিশব্দ লেখ ঃ** ফুল, তপন, জল।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কমল কোথায় ফোটে?

২। সূর্যমুখী উর্ধ্বে কার দিকে তাকায়?

৩। যূথিকার কলি কি দান করতে বলে?

৪। 'কনক-বরণ দীপ্তি' কার?

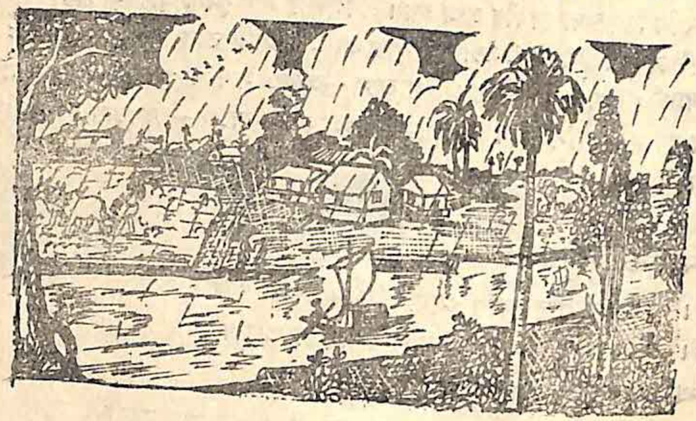
৫। কারা দেবের বারতা বয়ে আনে?

৬। ফুলের ভাষা কবিতায় কোন্ কোন্ ফুলের নামোল্লেখ করা হয়েছে?

৭। কে, কিভাবে বলে 'হিমবায় রবে কতক্ষণ'?

বর্ষায়

করুণা নিধান বন্দোপাধ্যায়



গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে 'ঢল',
আকাশের কোলে কমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে।
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাকো হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট্ ঝরিতেছে একঘেয়ে।
ভাসিল পুকুর আউসের ভুঁই
পালায় কাৎলা কালবোস রুই,
আঙিনায় জল করে ছল্‌ছল্‌ ব্যাঙ ডাকে, হাঁস চরে
কাঁঠালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস।
গাছভরা জাম সুচিকন শ্যাম ফেটে যায় রসভরে।
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই ;
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই ;
চলে গেছে চিল গগনের নীল গ'লে গেছে জলধারে।
রাঙা আঁখি মেলি' আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ—চন্দন দীঘিপারে।
মেঘ মন্থর জল ঝরঝরে
যত কেয়াঝাড় ফুলে গেছে ভ'রে,
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে মধু লুণ্ঠন লাগি'।
পাতার প্রান্তে খর কণ্টকে
পাখা কাটাকাটি অলির কটকে,

কান্ত কঠোর কুসুম—তোটকে পরাগের ভাগাভাগি
যুথী মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি,

মুকুতার পাঁতি যায় গড়াগড়ি,
ধূলাকাদামাখা পাঁপড়িতে ঢাকা কামিনী-তরুর তলা।
দূর নির্জনে তমালের ডালে,
শ্যামলা মালতী সুধাধারা ঢালে,
বন তমালের কানে কানে তার কি কথা হ'লনা বলা।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি : গ্রামে বর্ষা নেমেছে। চারদিক জলে টইটম্বুর। হাট বসে নি। পুকুর থেকে রুই কাৎলা পালিয়ে আঙিনায় ভাসে। ব্যাঙ ডাকে ও হাঁস চরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ঝড়ের দাপট চলতে থাকে। কুঞ্জ থেকে লেবুর মধুর গন্ধ নাকে আসে। যুথী, মালঞ্চ, কামিনী, মালতী ও তমালের গাছগুলি গভীর ভাবে আন্দোলিত হতে থাকে।

কবি পরিচিতি : ১৮৭৭ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে কবি করুণানিধানের জন্ম। তিনি রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবি। 'বর্ষায়' কবিতাটি তাঁর লেখা 'শতনরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'ঝরাফুল', 'ধানদূর্বা', 'শান্তিজল' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ : গাঙে—নদীতে। কোমল—নরম। দুরন্ত—অশান্ত, চঞ্চল। আঙিনায়—উঠানে। সুবাস—সুগন্ধ। কুঞ্জ—বাগান। শিরে—মাথায়। অলি—মৌমাছি। নির্জন—জনশূন্য।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। বর্ষাকালে গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন হয়?

২। বর্ষাকালে ঝড়ের আন্দোলনের ফলে ফুল গাছগুলির অবস্থা কিরূপ হয়ে থাকে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **আকাশের কোলে……বড় দুরন্ত মেয়ে।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) বর্ষাকে 'দুরন্ত চঞ্চল মেয়ে' বলা হয়েছে কেন?

২। **বেধেছে সমর……লুণ্ঠন লাগি**

(ক) কোন্ কবিতার অন্তর্গত? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির সরল অর্থ লেখ।

৩। দূর নির্জনে……কথা হ'ল না বলা।

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? (খ) কবির নাম কি? (গ) এর তাৎপর্য নিজের ভাষায় লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। বর্ষাকালে গ্রামে হাট বসে না কেন?

২। বর্ষায় কোন্ ফুলের সুবাস মাতাল করে?

৩। বর্ষার সময় বাবুই কি করে?

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ** বসে নাকো, বুনিছে, গেছে, মুকুতার, শ্যামলা, ভাসিল।

২। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** আকাশ, চঞ্চল, শ্যাম, মেঘ, মাতাল, গাছ।

৩। **নীচের রেখাঙ্কিত শব্দগুলি কোন্‌টি কি পদ লেখ ঃ**

(ক) গ্রামে ঢোকে জল, (খ) বড় দুরন্ত মেয়ে। (গ) আঙিনায় জল করে ছল্ ছল্ ব্যাঙ ডাকে, (ঘ) চলে গেছে চিল, (ঙ) যত কেয়া ঝাড় ফুলে গেছে ভ'রে, (চ) পাতার প্রান্তে খর কন্টকে,

৪। **প্রতিশব্দ লেখ ঃ** আকাশ, জল, বাদল, গ্রাম।

৫। **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্দেশ কর ঃ**

(ক) আকাশের কোলে কোমল কাজল,

(খ) চলে গেছে চিল গগনের নীল গ'লে গেছে জলাধারে।

(গ) মেঘ মন্থর জল ঝরঝরে

(ঘ) বেধেছে সমরে ভ্রমরে ভ্রমরে মধু লুণ্ঠন লাগি'।

(ঙ) যুথি মালঞ্চে ফুল ছড়াছড়ি।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ মাস নিয়ে বর্ষাকাল হয়?

২। বর্ষাকালে আকাশের কোল কিরূপ হয়?

৩। বর্ষাকালে ব্যাঙ কি করে?

৪। কোন্ দীঘির পারে লেবুকুঞ্জ আছে?

৫। 'বর্ষায়' কবিতায় কি কি ফুলের নামোল্লেখ করা হয়েছে?

৬। বর্ষায় কামিনী তরুর তলায় কি হয়?

৭। ভ্রমরদের মধ্যে বর্ষায় সমর বাধে কেন?

—



পণ্ডিতের পদ লভি' যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা-অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি, ;
—এতটুকু শিশু এক ! চেয়ে দেখি—দূরে আছে দাসী !
সযত্নে বসায়ে পাশে, শিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে ;
পিতৃহীন ; নিরুপায়, দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর ;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর !
ত্বরিতে আসন ছাড়ি' সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে-মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।
পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখির সম্মুখে,
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দারিদ্র্যের দুঃখে।
মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীর্বাদ করি'
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ-শঙ্কা হরি'—
'বাড়ীতে ক'জন থাক ?' শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদু কণ্ঠে—'বাড়ীতে আমরা পাঁচজন।'
'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই—
তুমি মা'র এক ছেলে ! আরও ত তিনজন চাই !'
তেমনি মধুর কণ্ঠে কহিল সে—'মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারাণী আর নারায়ণ।'
'বাকী তিনজন কে কে ?' শুধাইনু পরম বিস্ময়ে ;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে।

'রাধারাণী কে আবার—অন্য কেহ বাড়ীতে ত নাই ?'
সে কহিল, 'আছেই ত ; রাধারাণী সে মোদের গাই ।'
'ভোলা, সে কাহার নাম !' হাসিয়া শুধানু তার কাছে ;
'জানেন না ? ভারি দুষ্টু সে এক কুকুর-ভোলা আছে ।
'নারায়ণ কে আবার ?'—নাম শুনি' প্রণমি' চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে ।
প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হ'ল নাক ?—কত আর বলি বারে বারে !
'এই পাঁচজন বুঝি ?'—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্তা শিশুতেই জানে !

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ সত্যদাস নামে এক বালক তার মার সঙ্গে গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় বেদগ্রামে পড়তে আসে । পাঁচ বছর বয়সেই সে পিতৃহীন । গুরু-মশাই আদর করে তাকে কাছে ডেকে নেন । তার কাছে জানতে চান যে তাদের বাড়িতে কজন আছে । সত্যদাস উত্তর দিল যে পাঁচজন । সে, তার মা, বাড়ির কুকুর, গরু এবং নারায়ণ ঠাকুর । গুরুমশাই এই জবাবে প্রথমে বিস্মিত হন । পরে তিনি উপলব্ধি করেন যে শিশুরাই যথার্থ সত্য উপলব্ধি করতে পারে ।

কবি পরিচিতি ঃ ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলার জামশেরপুর গ্রামে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম । পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার বলাগড়ে । পিতার নাম হরিমোহন বাগচী । 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর', 'মহাভারতী' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ ।

শব্দার্থ ঃ প্রাতঃকালে—সকালে । সযত্নে—যত্ন সহকারে । পিতৃহীন—যার বাবা নেই । পাঠশালা—প্রাথমিক অক্ষর শিক্ষা যেখানে দেওয়া হয় । মৃদু—আস্তে । পণ্ডিত—জ্ঞানী । অন্তরে—হৃদয়ে ।

অনুশীলনী

বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন

১ । 'সত্যদাস' কবিতার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ ।
২ । সত্যদাস কে ? তার বাড়িতে কে কে ছিল ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"যদিও তা আঁখির……দারিদ্র্যের দুঃখে।"**
—উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতায় আছে? প্রসঙ্গ কি? উদ্ধৃতিটির সরলার্থ নিজের ভাষায় লেখ।

২। **"অন্তরে বুঝিনু……শিশুতেই জানে।"**
—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি কে? প্রসঙ্গ কি? কবি কেন বলেছেন 'সত্যবার্তা শিশুতেই জানে?'

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে, "বাড়িতে আমরা পাঁচজন।"**
—কোন কবিতার উদ্ধৃতি? কবি কে? কে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করেছিল? পাঁচজন কে কে?

২। **"রাধারাণী কে……বাড়ীতে ত নাই।"**
—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? কবি কে? রাধারাণী কার নাম?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। সত্যদাস কার সাথে পাঠশালায় এসেছিল?
২। গুরুমশাই সত্যদাসের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন?
৩। গুরুমশাই কেমন করে সত্যদাসের সঙ্কোচ দূর করেন?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ** লভি, বসিনু, শুনিনু, পরশিয়া, উত্তরিল, শুধানু বুঝিনু, মোদের।
২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** পণ্ডিত, শিশু, আশীর্বাদ, দুষ্টু, আত্মীয়, সসম্ভ্রমে, সরল, মধুর।
৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** বিদ্যা, দরিদ্র, শৈশব, বিস্ময়, মধুর।
৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** অধ্যয়ন, আশীর্বাদ, নিশ্চিন্ত।

মৌখিক প্রশ্ন

১। পিতৃহীন বলতে কি বোঝ?
২। ভোলা কে?
৩। নারায়ণ কে?
৪। রাধারাণী কার নাম?

—



মেথর

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত —

কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি !
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথবীরে নির্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ মেথরকে অস্পৃশ্য বলে অনেকে উপেক্ষার চোখে দেখে। কবি বলছেন, মেথর পৃথিবীকে নোংরা ও আবর্জনাশূন্য করে তোলে। সেজন্য মানুষ লোকালয়ে বাস করতে পারে। গঙ্গাজলের মতই সে পৃথিবীকে বিষ-শূন্য করে। কবি কল্যাণকর্ম সাধন করতে গিয়ে লাঞ্ছনা সহ্য করার মত সহিষ্ণুতা অর্জনের জন্য মেথরের কাছে শক্তি ও অনুপ্রেরণা চান।

কবি পরিচিতি ঃ ছন্দ বিশারদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রজনীনাথ দত্ত, পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত। মাতা মহামায়া দেবী। 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা' 'অভ্রআবীর' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ঃ অস্পৃশ্য—ছোঁয়ার অযোগ্য। অশুচি—অপবিত্র। শিশুজ্ঞানে—শিশুর মত মনে করে। নির্বিচার—বিচার না করে। অহর্নিশ—দিন ও রাত্রি। নির্বিকার—বিকারশূন্য। নীলকণ্ঠ—মহাদেব। নির্মল—পরিষ্কার।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। মেথর সমাজের কি উপকার করে? মেথর না থাকলে আমাদের অবস্থা কি হত?

২। কবি মেথরকে কেন 'গঙ্গাজল' ও 'নীলকণ্ঠে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **নীলকণ্ঠ করেছেন……করেছ নির্মল।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) নীলকণ্ঠ কে? (ঘ) তিনি কিভাবে পৃথিবীকে নির্বিষ করেছেন?

২। **কল্যাণের কর্ম……লাঞ্ছনা সহিতে।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কবি মেথরের কাছে কি বাণী জেনেছেন?

২। মেথর না থাকলে মানুষের অবস্থা কি হত?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ** তোমারে, সদা, নাহিক, পৃথ্বীরে, চিতে, নহিলে।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** নির্বিচার, নির্বিকার, নির্বিষ, নির্মল, অহর্নিশ।

৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** অস্পৃশ্য, শিশু, ঘৃণা, নির্মল, লাঞ্ছনা।

৪। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** বন্ধু, মানুষ, শুচি, রুচি, নির্বিষ, কল্যাণ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। মেথরের মত উপকারী আরও তিনজন সমাজবন্ধুর নাম কর।

২। নীলকণ্ঠ কার নাম?

৩। গঙ্গার আরও দুটি নাম বল।

—

স্নেহের জয়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক



ভীষণ সমরে বিক্রমে যুঝি' রাজপুত গেল হারি,'
প্রবেশিল আসি' তুর্কী সৈন্য হিন্দুর বাড়ি বাড়ি।
জহর-ব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ-কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে সীতা সতী সারি সারি।
বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটি রমণী পিয়াইছে দুধ তনয়ে ধরিয়া বুকে।
প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ,
জল নাই চোখে, বেদনা দারুণ ফুটিয়া উঠিছে মুখে!
অরাতি-শিশুরে সৈন্য জনেক জোরে নিতে চায় কেড়ে,
জাপটি ধরিল বক্ষে জননী আপন তনয়টিরে।
এত কি কঠিন বাহু সুকোমল,
ছাড়াতে নারিল সৈন্য সবল,
গর্বিত সেনা অসির আঘাত হানিল জননীশিরে।
রুধিরের ধারা ঢাকিয়া ফেলিল বালকের সারা দেহ,
দূর হতে তাহা দেখিয়া সেনানী প্রবেশিলা আসি' গেহ।
বলিলেন ডাকি-"ওরে নরাধম,
মানুষের হৃদি এত নির্মম,
পাস্‌নি পামর কখনো কি তুই নিজ জননীর স্নেহ?"
সভয়ে সরিয়া দাঁড়াল সৈন্য নত করি আঁখিজোড়,
সেনাপতি বলে, "ও বাহু ছাড়াতে সাধ্য কি আছে তোর?

স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন,
ভরতপুরের চেয়ে দুর্জয় ও-যে জননীর ক্রোড়।"
জননীকণ্ঠে জড়াইল শিশু দুটি বাহু সুকোমল,
দেখি' সেনানীর বিশাল নয়ন হয়ে এলো ছলছল।
বলিলেন বীর, "ক্ষম অপরাধ,
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ,
স্নেহের দুর্গ ভাঙিতে নাই মা আমাদের বুকে বল॥"

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ তুর্কী রাজপুতদের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। তাতে রাজপুতেরা পরাজয় বরণ করে। অসংখ্য রাজপুত যোদ্ধার মৃত্যু ঘটে। রাজপুত রমনীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিয়ে জহর ব্রত পালন করে। রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে এক রমণী তার সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন। এমন সময় তুর্কী সৈন্যরা সেখানে ঢুকে মায়ের কাছ থেকে সেই শিশুটিকে ছিনিয়ে হত্যা করতে চায়। শিশুটি তার সুকোমল বাহু দিয়ে জননীকে আঁকড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তুর্কী সৈন্যরা নিষ্ঠুর ভাবে জননীর মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে। শিশুর সারা শরীর রক্তে ভেসে যায়। এমন সময় তুর্কী-সেনাপতি সেখানে আসেন। তিনি রূঢ় কণ্ঠে ঘাতক তুর্কী সৈন্যকে তিরস্কার করেন। পরে সসৈন্যে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যান।

কবি পরিচিতি ঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের কোগ্রামে কুমুদরঞ্জনের জন্ম। তিনি ছিলেন শিক্ষক। 'একতারা', 'বনতুলসী', 'অজয়' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। কুমুদরঞ্জন পল্লী বাংলার আসল কবি।

শব্দার্থ ঃ ভীষণ—ভয়ানক। সমরে—যুদ্ধে। প্রাণেশ—স্বামী। বাহু—হাত। সেনানী—সেনানায়ক। পামর—ঘাতক। ক্রোড়—কোল। সুকোমল—খুব নরম। বল—শক্তি।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। রাজপুত ও তুর্কীদের যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিজের ভাষায় লেখ।
২। 'স্নেহের দুর্গ' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **প্রাণেশ বালার······উঠিছে মুখে।**
(ক) উদ্ধৃতিটি কোন কবিতায় আছে? (খ) কবি কে? (গ)

'বীরের শয়ানে ঘুমায়েছে আজ' কথাটির তাৎপর্য কি ? (ঘ) রমণীটির মুখে বেদনার ভাব ফুটে উঠেছে কেন ?

২। **স্নেহের দুর্গ……বুকে বল।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) কবি কে ? (গ) উদ্ধৃতিটির ভাবার্থ পরিস্ফুট কর।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"ও রে নরাধম,……জননীর স্নেহ।"**

(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতায় আছে ? (খ) কে কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিল ? (গ) এরূপ উক্তির কারণ কি ?

২। **"ও বাহু ছাড়াতে……আছে তোর।"**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার ? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে কে এরূপ উক্তি করেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। জহর ব্রত কি ?

২। তুর্কী সেনারা কেন শিশুটিকে তার জননীর কোল থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল ?

২। **গদ্যরূপ লেখ :** সমরে, যুঝি, প্রবেশিল, ঘুমায়েছে, উঠিছে, জাপটি, নারিল, জড়াইল, গেহ।

২। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর :** রাজপুত, রমণী, জননী, গঠিত, বীর, বালক।

৩। **চারটি করে প্রতিশব্দ লেখ :** অনল, জল, জননী।

৪। **বিপরীত শব্দ লেখ :** মুক্ত, বিশাল, কোমল, স্নেহ, বীর, সবল।

৫। **পদ পরিবর্তন কর :** তুর্কী, বিজয়ী, বীর, জল, রুধির, বাঁধন।

৬। **বাক্য গঠন কর :** স্বর্ণ-কমল, দারুণ, নরাধম, আঁখিজোড়, সুকোমল।

মৌখিক প্রশ্ন

১। তুর্কী কাদের বলে ?

২। জহর ব্রত কি ?

৩। ব্রহ্মা কে ?

৪। সেনাপতি কাদের বলে ?

৫। ভরতপুর কোথায় ?

৬। দুর্গ কাকে বলে ?

—



জোলো দুধ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



গোপালের ভোগে লাগিবে দুগ্ধ, তুই দিস্ তাহে জল ?
রে মূঢ় গোয়ালা ! পাবি সে পাপের সমুচিত প্রতিফল।
হাসিয়া গোয়ালা কহে,—
শুনেছি ঠাকুর, মার দুধে নাকি তের আনা জল রহে ?
ভক্তির চোটে ভগা গোয়ালার সেই দুধ হ'ল খাঁটি ।
আমি যদি দিই সেরে আধপোয়া, সব হয়ে যায় মাটি ?
বড় গোয়ালার বড় করবার, ভিতরে ভেজাল সব ;
তার বেলা যত ধরা পড়ে ফাঁকি, তত উঠে জয়-রব ।
মাপ তার সাত খুন ;—
গরীব গোয়ালা দায়ে ঠেকে, যদি পান থেকে খসে চুণ ।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ গোপালের দুধে জল দেবার জন্য কবি গেয়ালাকে তিরস্কার করেন। গোয়ালা বলল যে মায়ের দুধে ষোল ভাগের তের ভাগ জল থাকে। ঈশ্বর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে সব কিছুতেই ভেজাল। সুতরাং বিধাতা পুরুষ স্বয়ং ভেজালের কারবারী। অতএব, গোয়ালার অপরাধ তত মারাত্মক নয়।

কবি পরিচিতি ঃ বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। পৈতৃক নিবাস শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম। পিতা দ্বারকানাথ সেন-গুপ্ত। কবি যতীন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। 'মরুশিখা' 'মরুমায়া' 'সায়ম' প্রভৃতি তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ। কবিতাটি 'মরুশিখা'র অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ গোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। মূঢ়—নির্বোধ। সমুচিত—উপযুক্ত। ভক্তি—অনুরক্তি। কারবার—ব্যবসা। জয়-রব—জয়সূচক ধ্বনি। দায়ে—অপরাধে, দোষে।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। জোলো দুধ কবিতার সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।
২। 'জোলো দুধ' কবিতার বিদ্রূপাত্মক দিকটি আলোচনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"বড় গোয়ালার……ভেজাল সব,"**
(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির সরলার্থ লেখ।
২। **পাপ তার সাত……খসে চূণ।**
(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতায় আছে? (খ) কবি কে? (গ) তাৎপর্য নিজের ভাষায় লেখ।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** জোলো, পাপ, মূঢ়, ফাঁকি, জয়।
২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** মূঢ়, ভেজাল, গরীব, ভক্তি, পাপ।
৩। **বাক্য গঠন কর ঃ** সমুচিত, প্রতিফল, জয়-রব, কারবার, সাতখুন মাপ, পান থেকে চূণ খসা।
৪। **লিংগ পরিবর্তন কর ঃ** গোয়ালা, গোপাল, ঠাকুর।

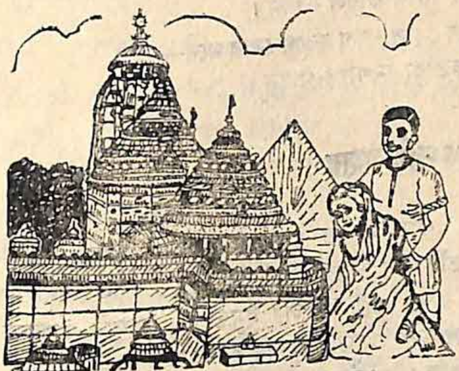
মৌখিক প্রশ্ন

১। গোপাল কার নাম?
২। গোয়ালা কি করে?
৩। ভগা গোয়ালা কে?
৪। দুধ কি পদার্থ?

—

তীর্থ মন্দিরে

কালিদাস রায়





দূর তীর্থে পাষাণ-মন্দিরে
হেরিতেছি দেবমূর্তি দাঁড়াইয়া যাত্রীদের ভিড়ে।
চেয়ে রই দেবতার শ্রীআনন পানে
ভক্তি মোর জাগে না পরাণে।
পাশে হেরি বৃদ্ধা এক ন্যুব্জ পৃষ্ঠ তার
যষ্টিতে রাখিয়া দেহভার,
একদৃষ্টি মূর্তিপানে রয় সে চাহিয়া—
ঝরিতেছে অশ্রু তার লোলচর্ম কপোল বাহিয়া।
সহসা উল্লাসভরে কহিল সে নিজপুত্রটিরে
শীর্ণ পাণিখানি তার বুলাইয়া স্নানসিক্ত শিরে,
"ওরে বাছাধন,
সার্থক করিলি তুই এতদিনে আমার জীবন।"
সেই জনতার মাঝে পুত্র তার তিতি অশ্রুজলে
লুটায়ে পড়িল তার জননীর চরণযুগলে।
সহসা হইল যেন বিদ্যুৎসঞ্চার
জাগিয়া উঠিল জড় প্রতিমায় দেবতা আমার।
সহসা নামিল ঢল এ শুষ্ক নয়ানে
অঙ্কুরিল ভক্তিবীজ পাষণ্ডের এ পাষাণ-প্রাণে।
ধূপগন্ধে আমোদিত মন্দির-চত্বর,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে কাঁসর ঝাঁঝর,
ঘন ঘন হয় শঙ্খনাদ,
দেবতার মুখে হেরি বিগলিত পরম প্রসাদ।

মাতা পুত্র দেবতার ত্রিবেণী-সঙ্গম।
আমার স্থাবর চিত্তে করিল জঙ্গম।
অনন্ত মুহূর্ত হয়ে সে সু-ক্ষণ জাগে মোর মনে—
যেন নব শুকতারা নিশান্ত-গগনে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি : কবি মন্দির প্রাঙ্গণে যান। কিন্তু দেবীর পাষাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে ভক্তির সঞ্চার হয় না। তিনি দেখেন যে একজন স্নানসিক্তা শীর্ণকায়া বৃদ্ধা তাঁর ছেলের হাতে ধরে মন্দিরে এসেছেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন যে দেবীদর্শনে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছে। পুত্র তাঁর জননীর চরণ প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। তখন কবি দেখেন যে মন্দিরের পাষাণ মূর্তিও যেন সজীব রূপ ধারণ করেছে। তার মন ভক্তিতে তখন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কবি পরিচিতি : কবি ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। 'বৈকালী', 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

শব্দার্থ : তীর্থে—ধর্মস্থানে। পাষাণ—পাথর। ভক্তি—অনুরক্তি। ন্যুব্জ—বক্র। পাণিখানি—বাহুটি। কপোল—গাল। স্নানসিক্ত—সদ্য স্নান করা। শিরে—মাথায়। শীর্ণ—রোগা। অশ্রু—চোখের জল। সহসা —হঠাৎ। স্থাবর—নিশ্চল। অনন্ত—যার অন্ত নেই।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'তীর্থ মন্দিরে' কবিতার বিষয় বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।
২। কবির কখন মনে হয়েছিল জড় প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **সহসা-হইল যেন……দেবতা আমার।**
উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অংশ? কবি কে? প্রসঙ্গ কি? উদ্ধৃতিটির সরলার্থ লেখ।
২। **ঘন ঘন হয়……ত্রিবেণী-সঙ্গম।**
—উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতার অন্তর্গত? প্রসঙ্গ কি? 'ত্রিবেণী সঙ্গম' বলতে কবি কি নির্দেশ করেছেন।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"ও রে বাছাধন……আমার জীবন।"**
—উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতায় আছে? কে কাকে কখন এরূপ বলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। দেবতার পাষাণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে কবির প্রথম কি মনে হয়েছিল?
২। বৃদ্ধা কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিল?
৩। কবির কখন মনে হল পাষাণ মূর্তি সচল হয়ে উঠেছে?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ** হেরিতেছি, মোর, করিলি, জাগিয়া, পরাণে।
২। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ** দেবতা, জননী, পুত্র, পাষণ্ড, বৃদ্ধা।
৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** দেবতা, শীর্ণ, ভক্তি, বিদ্যুৎ, স্থাবর।
৪। **বাক্য গঠন কর ঃ** দেবমূর্তি, একদৃষ্টি, স্নানসিক্ত, উল্লাসভরে, অঙ্কুরিল, ভক্তিবীজ, বিদ্যুৎ সঞ্চার।
৫। **রেখাঙ্কিত শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি নির্দেশ কর ঃ**
(ক) দূর তীর্থে পাষাণ মন্দিরে,
(খ) ভক্তি মোর জাগে পরাণে,
(গ) সহসা উল্লাসভরে কহিল পুত্রটিরে।
(ঘ) ধূপগন্ধে আমোদিত মন্দির চত্বর

মৌখিক প্রশ্ন

১। পাষাণ-মন্দির কি?
২। কপাল ও কপোল এই দুটি শব্দের পার্থক্য কি?
৩। আকাশে শুকতারা কখন দেখা যায়?
৪। বৃদ্ধা কিসের ওপর তার দেহভার রেখেছিল?
৫। জঙ্গম শব্দটির অর্থ কি?
৬। 'শঙ্খনাদ' কথাটির অর্থ কি? কখন শঙ্খনাদ করা হয়?

পল্লী
নজরুল ইস্‌লাম



হেথা দক্ষিণে ছোট নদী কুলকুলু বয়
আর কূলে কূলে বন-বীথি ফুলে ফলময়,
হেথা ভেসে আসে বড় মিঠে দখিনা মলয়,
কুসুমের মধুবাসে মন উচাটন।
ওই দূর প্রান্তর—ঘেরা আমাদের বাস
কিবা দুধে হাসি হাসে কচি দূর্বার-ঘাস,
আর উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ।
মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল
সদা খুশী ভরা বুক হেথা, হাসি ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি যে ভেঙে হরিতকী ডাল
শাখায় শাখায় পাখী, গানের মাতন।
হেথা ঘাটে ঘাটে তরী বাঁধা—মাঠে মাঠে ধান,
হেথা বনে বনে উঠে নিতি বিহগের গান,
হেথা হাতে হাত রাখি মোরা, প্রাণে রাখি প্রাণ—
ঘরে ঘরে ভাইবোন, বন্ধুস্বজন।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ছোট নদীর তীরে কবির গ্রাম। তীরে ফুল ও ফলের গাছ, শস্য ক্ষেত, উপরে আকাশ এবং নীচে দূরবিস্তৃত মাঠ। এখানে ফুলের গন্ধে মন মাতায়। রাখালেরা মাঠে গরু চরায়। গাছের ডালে ডালে পাখীর গান মন মাতায়। গ্রামবাসী সকলেই মিলেমিশে আপনজনের মত বাস করে।

কবি পরিচিতি ঃ বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নজরুলের জন্ম। পিতার নাম ফকির আহম্মদ। প্রথম মহাযুদ্ধে কবি সৈন্যদলে যোগ দেন। তিনি বহু কবিতা ও গানের রচয়িতা। 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'সর্বহারা' প্রভৃতি তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ।

শব্দার্থ ঃ হেথা—এখানে। মলয়—বাতাস। উচাটন—মাতায়। বেণু—বাঁশী। শাখায়—ডালে। বিহগ—পাখী। তরী—নৌকা। নিতি—রোজ, প্রতিদিন। ধেনুগণ—গরুগুলি।

অনুশীলনী

বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন

১। 'পল্লী' কবিতায় বঙ্গপল্লীর যে স্নিগ্ধ মধুর রূপ ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

২। এই কবিতাটি কবির গ্রাম সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা জন্মেছে সেটা নিজের ভাষায় লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **"হেথা ভেসে……মন উচাটন।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার? (খ) কবি কে? (গ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২। **"আর উপরে……চরে ধেনুগণ।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) সরলার্থ নিজের ভাষায় লেখ।

৩। **হেথা হাতে……বন্ধুস্বজন।**

(ক) কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কবি কে? (গ) এই কবিতা পড়ে গ্রামবাসীদের সম্পর্কে কি ধারণা জন্মায়?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **গদ্যরূপ লেখ ঃ** হেথা, দখিনা, চাহিয়া, নিতি, মোরা।

২। **চারটি করে প্রতিশব্দ লেখ ঃ** পল্লী, ফুল, পাখী, আকাশ।

৩। **অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর ঃ** কূল ও কুল, স্বজন ও সজন এবং তরী ও তরি।

৪। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** বন, দক্ষিণ, আকাশ, মাঠ, মাটি, ধান।

৫। **বাক্য গঠন কর ঃ** কুলকুল, ফুলময়, ধেনুগণ, বিহগ, ভাইবোন, বন্ধুস্বজন।

মৌখিক প্রশ্ন

১। পল্লীর কোথায় তরী বাঁধা থাকে?

২। পাখীরা কোথায় গান করে?

৩। গ্রামবাসীরা কি দিয়ে বাতাস করে?

৪। গ্রামের সবাই কেমন করে থাকে?

ব্ল্যাক মার্কেট

সুকান্ত ভট্টাচার্য





হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,
ব্ল্যাক মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।
কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও
তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাব ও।
একা থাকে, তাই হরি চাকরটা রক্ষী।
ত্রিসীমানা মাড়ায় না তাই কাক-পক্ষী।
বিশ্বে কাউকে রাম কাছে পেতে চান না,
হরিই বাজার করে, সে-ই করে রান্না।
এমনি ক'রেই বেশ কেটে যাচ্ছিল কাল,
হঠাৎ হিসেবে রাম দেখলেন গোলমাল,
বললেন চাকরকে ; কি রে ব্যাটা, কি ব্যাপার ?
এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার ?
আলু তিন টাকা সের ? পটোল পনেরো আনা ?
ভেবেছিস বাজারের কিছু বুঝি নেই জানা ?
রোজ রোজ চুরি তোর ? হতভাগা, বজ্জাত !
হাসছিস ? এক্ষুনি ভেঙে দেব সব দাঁত।
খানিকটা চুপ করে বলল চাকর হরি ;
আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ধনীরাম পোদ্দার একজন অর্থশালী ব্যক্তি। সে গরীব চাষীকে ঠকিয়ে জোতদার ও মহাজনকে হাত করে কলকাতার বালিগঞ্জে ছয়-ছয়টা বাড়ি হাঁকিয়েছে। এত যার টাকা—তার আপনজন বলতে একমাত্র বাড়ির চাকর হরি। বাজার, রান্না সবকিছু সে একাই করে। হরি বাজার থেকে জিনিস এনে তার

দাম বাড়িয়ে বলত। ধনীরাম একদিকে তাকে জবাব দিহি করল—সে কেন জিনিসের দাম এত বাড়িয়ে বলে। খানিকটা চুপ করে থাকার পরে হরি বলল, 'আপনার দেখাদেখি আমিও ব্ল্যাক মার্কেট করছি।'

কবি পরিচিতি ঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। পিতার নাম নিবারণচন্দ্র, মাতা সুনীতি দেবী। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর কাব্যের মূল সুর। 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'মিঠেকড়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ মহাজন—যারা সুদ নিয়ে টাকা ধার দেয়। জোতদার—অনেক জমির মালিক। ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। ত্রিসীমানা—ধারে কাছে। ব্ল্যাক-মার্কেট—অসদুপায়ে ব্যবসা করে অর্থোপার্জন। হতভাগা—মন্দ ভাগ্য। বজ্জাত—তিরস্কার বিশেষ। খানিকটা—অল্প কিছুক্ষণ। এক্ষুনি—এই মুহূর্তে। দেখাদেখি—অনুকরণ করে।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ধনীরাম পোদ্দার কি ভাবে টাকা উপার্জন করেছিল ?

২। 'ব্ল্যাক-মার্কেট' কবিতায় সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষকে কেন ব্যঙ্গ করা হয়েছে ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **কেউ নেই ত্রিভুবনে……লোক-মারা স্বভাবও।**
(ক) কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) কবি কে ? (গ) 'লোক মারা স্বভাব' বলতে কবি কি নির্দেশ করতে চেয়েছেন ?

২। **আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক মার্কেট করি।**
(ক) কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? (খ) কবি কে ? (গ) প্রসঙ্গ কি ? (ঘ) এরূপ বলার মধ্য দিয়ে বক্তা কি ইঙ্গিত করেছেন ?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **কি রে ব্যাটা……রোজকার ?**
(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ কবিতায় আছে ? (খ) কে কাকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ধনীরাম পোদ্দার কাদের হাত করেছিল ?
২। সে কিভাবে কোথায় ছটা বাড়ি হাঁকিয়েছিল ?
৩। হরি কি কি কাজ করত ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** স্বভাব, রক্ষী, হতভাগা, চাকর, ধনী।
২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** মহাজন, অভাব, গরীব, চাকর, কাছে, ভেঙে।
৩। **বাক্য গঠন কর ঃ** ত্রিভুবন, ত্রিসীমানা, কাক-পক্ষী, বজ্জাত, রোজকার।

মৌখিক প্রশ্ন

১। মহাজন কাদের বলে ?
২। জোতদার বলতে কি বোঝায় ?
৩। ব্ল্যাক মার্কেট কাকে বলে ?
৪। ত্রিভুবন কি কি ?
৫। বালিগঞ্জ কোথায় ?



প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, "এখন কি করি ? কোথায় যাই ? এ নিবিড় জঙ্গল ত থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কি প্রকারে ? যাই বা কোথায় ? বাড়ী ফিরিয়া যাইব ? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে ? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হইবে, চোর ডাকাতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায় ? যাহাকে পাইব তাহাকেই বা বিশ্বাস কি ? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ ? এ ধন রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে ?"

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, "অদৃষ্টে যাহাই হোক, দারিদ্র-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুর আর এ জঙ্গলে তফাৎ কি ? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও না হয় তাই করিবে।"

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিল। গরুর সেবা করিল। শেষ, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কি ? হাঁড়ি, কাঠ, চাল-দাল সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায় ? প্রফুল্ল ভাবিল, "সন্ধান করিয়া লইব।" জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "কোথা যাইবে, মা ?"

প্রফুল্ল। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এদিকে হাটের পথ কোথা ?

প্র। তবে কোন্ দিকে ?

ব্রা। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?

প্র। এই জংগল হইতেই ?

ব্রা। এই জংগলে তোমার বাস ?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেন না ?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে ?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর-ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে ?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভাল, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কি ?" প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে ! যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চালদাল কিনিতে পার।"

প্রফুল্ল বলিল, "সেই হলে ভাল হয়। কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত দেখিতেছি।"

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা ! তুমি আমার সংগে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সংগে করিয়া আরও নিবিড়তর জংগলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই ? দেখিল, সেখানে একখানি কুটীর আছে—তালচাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালাচাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল,—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি কলসি, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, "তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার লইয়া যাও।"

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "দাম কত দিতে হইবে ?"

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে ? দাও, ভাংগাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কি নিয়া হাটে যাইতেছিলে ?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল; বলিল, "মোহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।"

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হোক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন "সবই মোহর" কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল,"আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়-চোপড়ের বরাৎ আছে। ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, "মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ী চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে?" সর্বনাশ। প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না—আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে কর আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দার। আমার নাম ভবানীপাঠক।"

প্রফুল্ল স্পন্দনহীন। ভবানীপাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানীপাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ভবানী বলিল, "বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।"

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্তমধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আজ্ঞা হয়?"

ভবানী বলিল, "এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।" এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল; প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি।"

প্রফুল্ল দ্রব্যসামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানীপাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানীঠাকুরকে বসিতে প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানা ছেড়া কুশাসন ছিল।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয়-পরিচিতি ঃ প্রফুল্ল প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে অসহায় বোধ করল। তার সঙ্গে অনেক ধন-দৌলত। চারদিকে চোর-ডাকাতের ভয়। তবুও সে সাহস সঞ্চয় করে সেখানে থাকবে বলে স্থির করল। সে নির্জন বন্যপথ ধরে বাজারের উদ্দেশ্যে একটি মোহর নিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণবেশী ভবানী পাঠকের সঙ্গে তার দেখা হল। সে নিজেই তাঁর পরিচয় দিয়ে দামামা বাজাল। মুহূর্তের মধ্যে তার পঞ্চাশ জন অনুচর এসে উপস্থিত হল। তখন সে প্রফুল্লকে দেখিয়ে বলল যে সে তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছে। সুতরাং কেউ যাতে তার অনিষ্ট না করে সে দিকে নজর দিতে আদেশ দিল। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের শরণ নিল। পরে তারা দুইজনে প্রফুল্লের কুটিরে উপস্থিত হয়। প্রফুল্ল ভবানী পাঠককে একটা ছেঁড়া কুশাসনে বসতে দেয়।

লেখক-পরিচিতি ঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। পিতার নাম যাদবচন্দ্র। ইনি এবং যদুনাথ বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিপুল। এই অংশটি তাঁর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ প্রভাতে—সকালে। নিবিড়—গভীর। বহিয়া—বহন করিয়া। সম্বরণ—নিবারণ। বিশ্বাস—আস্থা। অবধি—পর্যন্ত। অদৃষ্টে—ভাগ্যে। তফাৎ—পার্থক্য। প্রবৃত্ত—নিযুক্ত। অলৌকিক—অস্বাভাবিক। গৌরবর্ণ—ফরসা রং। সুপুরুষ—সুন্দর পুরুষ। বিস্মিত—অবাক। ইচ্ছাপূর্বক—স্বেচ্ছায়। সুলক্ষণযুক্ত—সুন্দর বৈশিষ্ট্য মণ্ডিতা। যথেষ্ট—পর্যাপ্ত। মোহর—স্বর্ণমুদ্রা। প্রতারণা—ঠকান। সর্দার—দলপতি। স্পন্দহীন—নিস্পন্দ, স্পন্দনশূন্য। কম্পমান—কেঁপে ওঠে। মুহূর্তমধ্যে—এক নিমেষে। সড়কি—অস্ত্র বিশেষ। অনিষ্ট—ক্ষতি। অন্তর্হিত—অদৃশ্য। পশ্চাৎ—পিছনে।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'প্রফুল্ল ও ভবানী পাঠক' রচনায় প্রফুল্ল আর ভবানী পাঠকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পেয়েছে সেটা নিজের ভাষায় লেখ।

২। ভবানী পাঠকের চেহারার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও।
৩। প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? তাতে তার মনোভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক……আমার সঙ্গে এস।**
(ক) উক্তিটি কে, কাকে উদ্দেশ্য করে করেছিল?
(খ) এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তা কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছে?
২। **"আমাকে হাটেই যাইতে হইবে।"**
(ক) উক্তিটি কার? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছিল?
(গ) এর কারণ কি?
৩। **"কি আজ্ঞা হয়?"**
(ক) কারা কাকে একথা বলেছিল? (খ) এরূপ বলার কারণ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত কোথায় থাকবে বলে স্থির করে?
২। ভবানী পাঠক প্রফুল্লের মুখপানে চেয়ে কি ভেবেছিল?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর:** নামাবলি, যথেষ্ট, কালান্তক, অন্তর্হিত, কুশাসন, পরিষ্কার, শরণাগত।
২। **বাক্য গঠন কর:** সম্বরণ, জানাজানি, সিদ্ধান্ত, সুপুরুষ, সুলক্ষণযুক্তা, কম্পমান; স্থিরবুদ্ধি, মুহূর্তমধ্যে।
৩। **পদ পরিবর্তন কর:** প্রভাত, ধন, লোক, বিস্মিত, সাহস, ভয়, নিবিড়, নূন, প্রতারণা।
৪। **বিপরীত শব্দ লেখ:** চোর, লোভ, অভাব, সাক্ষাৎ, পণ্ডিত, সর্বনাশ বিশ্বাস, পশ্চাৎ, ভাঙ্গা।
৫। **চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর:** প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল; প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি, একেবারেই বুঝিল, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, "চলুন, আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি।"

মৌখিক প্রশ্ন

১। প্রফুল্ল কোন্ জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল?
২। মোহর কি?
৩। ভবানী পাঠক আসলে কে ছিলেন?
৪। দস্যু কাদের বলে?
৫। ভবানী পাঠকের কতজন অনুচর ছিল?
৬। প্রফুল্ল ও ভবানী পাঠকের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাসে আছে?



বছর দশ-বারো হল, এই শহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকয়েক ফ্রেন্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জেবলে, শাঁখ বাজিয়ে আইবুড়ো ভাত খাবার মতো—কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজকাল শহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। ... ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পন করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের ...গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় ...আশীর্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে ...ন ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ ...—প্রতিমে বিসর্জন, স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের ...গান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা ...স এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু ...কোন দিকেই যাননি, কেবল গুটি কয়েক ফ্রেন্ডকে ভালো করে তফাৎ এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদলা হাওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্মকর্তা মাছের জন্য বড়োই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষে একজন জেলে একটা সের দশবারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্মকর্তার খুশীর আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন 'বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বলো, তাই দেওয়া যাবে।' জেলে বললে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো! কর্মকর্তা 'বিশ ঘা জুতো!' শুনে অবাক হয়ে ...

মনে করলেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়তো পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হল। নেমন্তন্নে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্করা কত্তে লাগলো, কিন্তু কোনো রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না। শেষে কর্মকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে বলল—মশাই। একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকী দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান, দরজায় বসে আছে, তাকে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের আদ্দেক দাম না দিলে আমাকে ঢুকতে দেবে না বলেছিল, সুতরাং আমি আদ্দেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।' কর্মকর্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্যে মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্যে প্রতীক্ষে করে থাকতে হল না ; কর্মকর্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ জন্মতিথি উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনদের নেমন্তন্ন খাওয়াবার রেওয়াজ ছিল। ষাট বছরের বৃদ্ধেও জন্মদিনে চুল, গোঁপে কলপ দিয়ে গ্যাসের আলো জেবলে সাহেবদের অনুকরণে মদ গিলে বেসামাল হয়ে নাচগানে মাতত। আর তার গায়ের ব্যথা সারতে বেশ সময় নিত। বাগবাজারের এক বাবুর জন্মদিন। তিনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তার ইচ্ছে কয়েকজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ভোজের দিনে নিমন্ত্রিতেরা এসেছেন। কিন্তু কোনোরকম মাছ জোটানো গেল না। শেষে এক জেলে এল। তার হাতে দশ বারো সের ওজনের এক রুই মাছ। গৃহকর্তা দরদস্তুর করতে চাইলে সে বললে যে বিশ ঘা জুতা। সকলেই তো অবাক। জেলের গোঁ দেখে তার কথামত বিশ ঘা জুতো মারার ব্যবস্থা হল। দশ ঘা জুতো মারার পরে সে দরোয়ানকে বাকি দশ ঘা মারার অনুরোধ জানাল। কর্মকর্তা তখন দরোয়ানকেও দশ ঘা জুতো মেরে তার বখরা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৪০ সালে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশে তাঁর জন্ম। পিতা নন্দলাল সিংহ। 'মহাভারতে'র গদ্যানুবাদক, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁর বিখ্যাত রচনা। এই অংশটি তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'



বছর দশ-বারো হল, এই শহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকয়েক ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জেবলে, শাঁখ বাজিয়ে আইবুড়ো ভাত খাবার মতো—কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজকাল শহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ ষেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পন করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখতে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জন, স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের গা সারতে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সেরকমের কোন দিকেই যাননি, কেবল গুটি কয়েক ফ্রেণ্ডকে ভালো করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন সকালে বাদলা হাওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙালীদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্মকর্তা মাছের জন্য বড়োই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষে একজন জেলে একটা সের দশবারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্মকর্তার খুশীর আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন 'বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বলো, তাই দেওয়া যাবে।' জেলে বললে, "মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো! কর্মকর্তা 'বিশ ঘা জুতো!' শুনে অবাক হয়ে রইলেন,

মনে করলেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়তো পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হল। নেমন্তন্নে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মসকরা কত্তে লাগলো, কিন্তু কোনো রকমেই জেলের গোঁ ঘুচলো না। শেষে কর্মকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে বলল—মশাই। একটু থামুন, আমার একজন অংশীদার আছে, বাকী দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান, দরজায় বসে আছে, তাকে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের আদ্দেক দাম না দিলে আমাকে ঢুকতে দেবে না বলেছিল, সুতরাং আমি আদ্দেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলাম।' কর্মকর্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্যে মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্যে প্রতীক্ষে করে থাকতে হল না ; কর্মকর্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ জন্মতিথি উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনদের নেমন্তন্ন খাওয়াবার রেওয়াজ ছিল॥ ষাট বছরের বৃদ্ধও জন্মদিনে চুল, গোঁপে কলপ দিয়ে গ্যাসের আলো জেবলে সাহেবদের অনুকরণে মদ গিলে বেসামাল হয়ে নাচগানে মাতত। আর তার গায়ের ব্যথা সারতে বেশ সময় নিত। বাগবাজারের এক বাবুর জন্মদিন। তিনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তার ইচ্ছে কয়েকজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবেন। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। ভোজের দিনে নিমন্ত্রিতেরা এসেছেন। কিন্তু কোনোরকম মাছ জোটানো গেল না। শেষে এক জেলে এল। তার হাতে দশ বারো সের ওজনের এক রুই মাছ। গৃহকর্তা দরদস্তুর করতে চাইলে সে বললে যে বিশ ঘা জুতা। সকলেই তো অবাক। জেলের গোঁ দেখে তার কথামত বিশ ঘা জুতো মারার ব্যবস্থা হল। দশ ঘা জুতো মারার পরে সে দরোয়ানকে বাকি দশ ঘা মারার অনুরোধ জানাল। কর্মকর্তা তখন দরোয়ানকেও দশ ঘা জুতো মেরে তার বখরা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৪০ সালে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দেওয়ান বংশে তাঁর জন্ম। পিতা নন্দলাল সিংহ। 'মহাভারতে'র গদ্যানুবাদক, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁর বিখ্যাত রচনা। এই অংশটি তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'

থেকে গৃহীত। 'হুতোম প'্যাচা' তাঁর ছদ্ম নাম। এতে সেকালের কলকাতার সমাজ চিত্র মেলে।

শব্দার্থ ঃ ভদ্রলোক—শিষ্ট বা রুচিবান ব্যক্তি। জন্মতিথি—নির্দিষ্ট মাসের যে তিথিতে জন্ম সেদিন। ফ্রেন্ড—ইংরেজি শব্দ Friend। এর অর্থ বন্ধু। পুরুষ পরম্পরা—এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষ পর্যন্ত। শাঁখ—শঙ্খ। ভোজন—আহার। কুটুম্ব—আত্মীয়-স্বজন। বেতর গোছের—বেসামাল। অভিপ্রায়—মনোবাসনা। বিসর্জন—নিরঞ্জন। মতলব—ইচ্ছা, সংকল্প। জুটলেন—সমবেত হলেন। উদ্বিগ্ন—চিন্তিত। কর্মকর্তা—উদ্যোক্তা। সন্ধানে—খোঁজে। আশ্চর্য—বিস্ময়কর। গোঁ—জেদ। অংশীদার—অংশ আছে এমন ব্যক্তি। বক্রা—অর্ধেক ভাগ। প্রতীক্ষে—অপেক্ষা করা।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'আজব শহর কলকেতা' রচনায় সেকালের কলকাতার কি সমাজ চিত্র পাওয়া যায়?

২। সেকালের কলকাতায় সাহেবদের অনুকরণে জন্মতিথি উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি বর্ণনা দাও।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"মশাই, এর দাম বিশ ঘা জুতো"**—

(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা কোন্ গদ্যাংশে আছে? (খ) লেখক কে? (গ) এই কথাগুলি কে, কাকে, কখন এবং কেন বলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। সেকালে কলকাতায় জন্মতিথিতে কিভাবে আমোদ করা হত?

২। বাগবাজারের বাবু লোকটি কেমন ছিলেন?

৩। জেলে কেন দরওয়ানজীকে দশ ঘা জুতো দিতে বলেছিল?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাধুরূপ লেখ ঃ**

নেমন্তন্ন, মাছ, নাচ, প্রতিমে, বিসর্জন, মাত্তে, আদ্দেক, বক্রা।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** আশীর্বাদ, আশ্চর্য, মধ্যাহ্ন, উদ্বিগ্ন, পদার্পণ।

৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** ইংরেজ, ভাত, শহর, মাছ, উপস্থিত।

৪। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** জন্মতিথি, আশীর্বাদ, খাদ্য, খুশী, অম্লান,।

মৌখিক প্রশ্ন

১। আইবুড়ো কাদের বলে? ২। বাগবাজার কোথায়?

৩। সেকালে কলকাতায় বাহারে দিন কি কি ছিল?

৪। জেলে কেন তার মাছের দাম বিশ ঘা জুতা চেয়েছিল?

—

বর্ষায় গ্রাম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পদ্মার ওদিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এদিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকা বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়ে ঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখাবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল, নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্সর্ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে আর ধান নেই—নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নালফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে—সেখানে একতীরে ধানের ক্ষেত, আর একতীরে ঘন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে গ্রাম—মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে—স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধহয় কখনও দেখিসনি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে; ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে—তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে। তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যতরাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা, লতা, গুল্ম পচতে

থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ, জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু, রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন ভন করতে থাকে—এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে, তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকরনার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কি করে সয় আমি ভেবে পাইনে —এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একবারে পলাতকা হওয়া উচিত —এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই এবং সুবিধেও নেই।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ পদ্মা তীরবর্তী বর্ষাপ্লাবিত গ্রাম। চারদিক জলে থৈ থৈ করছে। ধানগাছ গুলির ডগা জলের ওপর মাথা তুলে আছে। খাল, বিল, মাঠ সব কিছুই জলে একাকার। এই জলস্রোতের মধ্যে কুটীরগুলি দাঁড়িয়ে আছে। তার চালে যত রাজ্যের কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ আশ্রয় নিয়েছে। গরুগুলি জলে ভিজছে। গ্রামের চারদিকের গাছপালার পাতা, লতা, গুল্ম, পাট পাতা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পেট-মোটা, পা-সরু উলঙ্গ ছেলেরা জলে খেলা করছে। গৃহস্থবধূরা জলে ভিজে কাজ করছে। প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে ও জ্বর হচ্ছে। পিলেওয়ালা ছেলেগুলো সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ কি করে জীবন যাপন করে সেটা ভেবে লেখক অবাক হয়ে যান।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মাতা সারদা দেবী। বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দান অসীম। এটি 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি চিঠি। রচনাটি প্রকৃতি বর্ণনা বিষয়ক।

শব্দার্থ ঃ চতুর্দিক—চার দিক। জলে মগ্ন—জলে ডোবা। প্রচ্ছন্ন—আবৃত। পানকৌড়ি—পাখী বিশেষ। জলস্রোত—জলপ্রবাহ। পরাভব—পরাজয়। দুর্লভ—যা সহজলভ্য নয়। সরীসৃপ—যে প্রাণি বুকে ভর দিয়ে চলে ; যেমন—সাপ, টিকটিকি। সহবাস—এক সঙ্গে থাকা। ঘন—নিবিড়। গৃহস্থ—গৃহবাসী। সহিষ্ণু—সহনশীল। অবিশ্রাম—একটানা। অবহেলা—উপেক্ষা। উপদ্রব—দৌরাত্ম।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। বর্ষায় গ্রামের পথঘাটের অবস্থা কি রকম হয় ?

২। বর্ষা কবলিত গ্রামবাসীদের দুরবস্থা দেখে লেখকের কি মনে হয় ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **'সকল রকম ক্ষমতার কাছে আমরা পরাভূত হয়ে আছি।'—**

(ক) কোন্ রচনার অংশ ? (খ) লেখক কে ? (গ) এখানে কি কি ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে ? (ঘ) কিভাবে আমরা পরাভূত ?

২। **"এদের দ্বারা জগতের......সুবিধেও নেই'—**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গদ্যাংশে আছে ? (খ) রচয়িতা কে ? কাদের সম্পর্কে এবং কেন একথা বলা হয়েছে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'বর্ষায় গ্রাম রচনায় কোথাকার গ্রামের কথা বলা হয়েছে ?

২। লেখক কেমন করে বর্ষাপ্লাবিত গ্রামের রূপ দেখেছেন ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর** ঃ চতুর্দিক, ইতস্তত, দুর্গন্ধ, আবর্জনা, দুর্লভ।

২। **পদ পরিবর্তন কর** ঃ জল, পরিচয়, স্নান, পরিত্যাগ, আচ্ছন্ন।

৩। **স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্দেশ কর** ঃ—

(ক) পদ্মার ওদিকে এখন **জল** কমে যাচ্ছে। (খ) কোথাও **মাঠের** চিহ্ন দেখবার জো নেই। (গ) মাঝখানে একটি পরিপূর্ণ **জলস্রোত** এঁকেবেঁকে চলেছে। (ঘ) **গ্রামের লোকেরা** ইতস্তত যাতায়াত করে। (ঙ) **এদের দ্বারা** জগতের কোন সুখ নেই।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বোট কি ?

২। পানকৌড়ি কি ?

৩। বাখারি কাকে বলে ?

৪। সরীসৃপ কি ?

থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চারিদিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ, জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু, রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন ভন করতে থাকে—এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে, তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকরনার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কি করে সয় আমি ভেবে পাইনে —এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একবারে পলাতকা হওয়া উচিত —এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই এবং সুবিধেও নেই।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ পদ্মা তীরবর্তী বর্ষাপ্লাবিত গ্রাম। চারদিক জলে থৈ থৈ করছে। ধানগাছ গুলির ডগা জলের ওপর মাথা তুলে আছে। খাল, বিল, মাঠ সব কিছুই জলে একাকার। এই জলস্রোতের মধ্যে কুটীরগুলি দাঁড়িয়ে আছে। তার চালে যত রাজ্যের কীতপতঙ্গ, সরীসৃপ আশ্রয় নিয়েছে। গরুগুলি জলে ভিজছে। গ্রামের চারদিকের গাছপালার পাতা, লতা, গুল্ম, পাট পাতা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পেট-মোটা, পা-সরু উলঙ্গ ছেলেরা জলে খেলা করছে। গৃহস্থবধূরা জলে ভিজে কাজ করছে। প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে ও জ্বর হচ্ছে। পিলেওয়ালা ছেলেগুলো সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করছে। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানুষ কি করে জীবন যাপন করে সেটা ভেবে লেখক অবাক হয়ে যান।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মাতা সারদা দেবী। বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দান অসীম। এটি 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি চিঠি। রচনাটি প্রকৃতি বর্ণনা বিষয়ক।

শব্দার্থ ঃ চতুর্দিক—চার দিক। জলে মগ্ন—জলে ডোবা। প্রচ্ছন্ন—আবৃত। পানকৌড়ি—পাখী বিশেষ। জলস্রোত—জলপ্রবাহ। পরাভব—পরাজয়। দুর্লভ—যা সহজলভ্য নয়। সরীসৃপ—যে প্রাণি বুকে ভর দিয়ে চলে ; যেমন—সাপ, টিকটিকি। সহবাস—এক সঙ্গে থাকা। ঘন—নিবিড়। গৃহস্থ—গৃহবাসী। সহিষ্ণু—সহনশীল। অবিশ্রাম—একটানা। অবহেলা—উপেক্ষা। উপদ্রব—দৌরাত্ম।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। বর্ষায় গ্রামের পথঘাটের অবস্থা কি রকম হয় ?

২। বর্ষা কবলিত গ্রামবাসীদের দুরবস্থা দেখে লেখকের কি মনে হয় ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **'সকল রকম ক্ষমতার কাছে আমরা পরাভূত হয়ে আছি।'—**
(ক) কোন্ রচনার অংশ ? (খ) লেখক কে ? (গ) এখানে কি কি ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে ? (ঘ) কিভাবে আমরা পরাভূত ?

২। **"এদের দ্বারা জগতের······সুবিধেও নেই'—**
(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গদ্যাংশে আছে ? (খ) রচয়িতা কে ? (গ) কাদের সম্পর্কে এবং কেন একথা বলা হয়েছে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'বর্ষায় গ্রাম রচনায় কোথাকার গ্রামের কথা বলা হয়েছে ?

২। লেখক কেমন করে বর্ষাপ্লাবিত গ্রামের রূপ দেখেছেন ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর** ঃ চতুর্দিক, ইতস্তত, দুর্গন্ধ, আবর্জনা, দুর্লভ।

২। **পদ পরিবর্তন কর** ঃ জল, পরিচয়, স্নান, পরিত্যাগ, আচ্ছন্ন।

৩। **স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্দেশ কর** ঃ—

(ক) পদ্মার ওদিকে এখন **জল** কমে যাচ্ছে। (খ) কোথাও **মাঠের** চিহ্ন দেখবার জো নেই। (গ) মাঝখানে একটি পরিপূর্ণ **জলস্রোত** এঁকেবেঁকে চলেছে। (ঘ) **গ্রামের লোকেরা** ইতস্তত যাতায়াত করে। (ঙ) **এদের দ্বারা** জগতের কোন সুখ নেই।

মৌখিক প্রশ্ন

১। বোট কি ?

২। পানকৌড়ি কি ?

৩। বাখারি কাকে বলে ?

৪। সরীসৃপ কি ?

মৃত্যুশয্যায় প্রতাপসিংহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা। আমি হতভাগ্য, দুর্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ করবেন না। শেষে মরবার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। রাণা।

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

[গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন]

ক্ষতি কি।

[সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

বাঁচার কোন আশা নাই?

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

[গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন]

[প্রতাপ শয্যায় অর্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন]

ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে তাকে গজনি পর্যন্ত প্রতাড়িত করে গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ যাতে কাগার-নদের নীল বারিরাশি

ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীর নারী চন্দাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি। ঐ সেই চিতোর। তা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম, কিন্তু পার্লাম না। কার্য প্রায় সমাধা করে এনেছিলাম। কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হোল। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়ে যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউয়ের পরে ঢেউ আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে, এইরূপে পৃথিবীর-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ! কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাকত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্তাম। কিন্তু —ওঃ—

[এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন]

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ! যন্ত্রণা মানসিক। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে একাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা!

প্রতাপ! আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা।

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিংহ। অমর বিলাসী; এ দারিদ্রের বিষ সহ্য কর্তে পার্বে না—তাই ভয় হয় যে আমি মরে গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পারাওর নামে অঙ্গীকার কর্ছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্তে পারি—[পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন]—অমরসিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আজ আমি যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়। কেঁদ না

বৎস ! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাঁদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যাঁরা এতদিনে সুখে, দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাঁদের ত্যাগ না কর, তাঁরা তোমাকে ত্যাগ কর্বে না। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমি তোমাকে সমস্ত মেবাররাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্তে পারো। আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—[অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন] এর সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখ্বে। আর কি বলব পুত্র। যাও জয়ী হও, যশস্বী হও।—সুখী হও।—এই আমার আশীর্বাদ লও।

[অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। ক্ষনেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন]

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে ! অমরসিংহ—কোথায় তুমি।—এস—প্রাণাধিক ! আরো—কাছে এস। —তবে যাই—যাই—লক্ষ্মী ! এই যে আস্‌ছি।

[কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন]

রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম ! মেবারসূর্য। প্রিয়তম ! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে !

[বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। রাজপুত সর্দারিগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল।]

পৃথ্বী। যাও বীর ! তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাকবে ; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণঅক্ষরে মুদ্রিত থাকবে আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে ; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ চিতোরের সন্নিহিত এক জঙ্গলে। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে সেখানে আছেন মৃত্যু পথ যাত্রী প্রতাপসিংহ। তাঁর অন্তিম

অভিলাষ অনুসারে তাঁকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। চিতোর দুর্গে এখন মোগলের পতাকা উড়ছে। অথচ এর সঙ্গে মিশে আছে মেবারের রাণাদের অনেক গৌরব ও ঐতিহ্য। প্রতাপের আক্ষেপ তিনি মোগলের হাত থেকে চিতোর পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। পৃথ্বীরাজ নামে একজন অনুচর তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। প্রতাপ সিংহ তাঁর বিলাসী পুত্র অমর সিংহের আমলে চিতোরের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে খুবই চিন্তিত। গোবিন্দসিংহ বীর বাপ্পাদিত্যের নামে শপথ করে চিতোর পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেন। রাণা প্রতাপ তাঁর পুত্র অমরসিংহকে সান্ত্বনা দেন। সব মানুষের জীবনেই একদিন মৃত্যু আসবে। সুতরাং পিতার শোকে যেন অমর সিংহ কোনরূপ আক্ষেপ না করে। তারপর প্রতাপ তাঁর তরবারি দিয়ে যান পুত্রকে। শেষ বারের মত আলিঙ্গন জানিয়ে প্রতাপ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অতুলনীয় শৌর্য ও পরাক্রমের কথা স্মরণ করে পৃথ্বীরাজ তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

লেখক-পরিচিতি ঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও গীতিকার। উদ্ধৃত নাট্যাংশটি লেখকের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক থেকে গৃহীত।

শব্দার্থ ঃ সন্নিহিত—সংলগ্ন। কৃপা—অনুকম্পা। ভক্তি—অনুরক্তি। অপলাপ—মিথ্যা ভাষণ। দুর্বল—বলহীন। পীড়িত—অসুস্থ। শোকাবসন্ন —শোকে ম্রিয়মান। শিবির—সাময়িক আস্তানা। সপ্রশ্ন নয়নে—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। ইত্যবসরে—এই অবসরে। জনান্তিকে—আড়ালে। অদূরে—অল্প দূরে। ম্লেচ্ছ—বিধর্মী। শোণিতে—রক্তে। সমাধা—শেষ। নিবৃত্তি —প্রশমন। উদ্ধত—অবাধ্য। অরণ্যে—বনে। অক্ষয়—যার ক্ষয় নেই।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। নাট্যাংশটিতে 'রাণা প্রতাপে'র চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে ?

২। প্রতাপ সিংহ তাঁর পুত্রকে কি কি উপদেশ দান করেন ?

৩। নাট্যাংশটির ঘটনাস্থল, সময় এবং চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে......ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোথায় আছে ? (খ) রচয়িতা কে ? (গ) কি প্রসঙ্গে উক্ত ? (ঘ) উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য কি ?

২। **যেখানে আমি……যায়।**

(ক) কোন্ রচনার অংশ ? (খ) কার লেখা ? (গ) প্রসঙ্গ কি ? (ঘ) এর মর্মার্থ লেখ।

৩। **ঢেউর পরে ঢেউ……অগ্রসর হয়।**

(ক) কোথায় পেয়েছ ? (খ) রচয়িতা কে ? (গ) এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয়, যন্ত্রণা মানসিক"**

(ক) কথাগুলো কার ? (খ) গোবিন্দ সিংহ কে ? (গ) বক্তা কি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন ? (ঘ) এর কারণ কি ?

২। **"তবে যাই—যাই—লক্ষ্মী।"**

—(ক) কার কথা ? (খ) প্রসঙ্গ কি ? (গ) কাকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলা হয়েছে ? (ঘ) লক্ষ্মী কে ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** দৈহিক, মানসিক, দুর্বল, পীড়িত, বীর, চিন্তা, উত্থান, বিক্রীত।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** শোকাবসন্ন, পুরুষোত্তম, ইত্যবসরে, অর্ধোত্থিত, দুর্গোপরি, ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণাধিক, পুণ্যার্জ্জিত, সিংহাসন।

৩। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** সৃষ্টি, অক্ষয়, পবিত্র, অসম্পূর্ণ, দারিদ্র্য, অসীম, মরবার, জনান্তিকে, অবনত।

৪। **প্রতিশব্দ লেখ (অন্ততপক্ষে চারটি করে) ঃ** সম্রাট, পুত্র, মৃত্যু, বন, পর্বত।

মৌখিক প্রশ্ন

১। গোবিন্দ সিংহ ও পৃথ্বীরাজ কে ?

২। চিতোরের দুর্গ কোথায় ?

৩। বাপ্পাদিত্য কে ছিলেন ?

৪। পদ্মিনী কে ?

৫। রাণা প্রতাপের পুত্রের নাম কি ছিল ?

৬। পর্যাঙ্ক কি ?

৭। চিতোরের দুর্গে কাদের পতাকা উড়ছিল ?

—



আমি যদি গান শুনতে চাই তবে অবশ্যই আমাকে বাংলা দেশে যেতে হবে, আমি যদি কবিতা শুনতে চাই তাহলেও আমাকে যেতে হবে বাংলা দেশে। বাংলা দেশের মধ্যেই ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু বাংলা দেশকে ভারতের অন্যত্র পাওয়া যাবে না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটি জাতির উত্থান-পতন সেই জাতির মহৎ লোকদের উপর নির্ভর করে। যে জনসাধারণ ভাল লোক সৃষ্টি করে থাকে সেই জনতা ঐ সব লোকের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। বাংলা দেশের যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আমাদের চোখে পড়ে সেটির কারণ হল এই যে, সেখানে গত শতাব্দীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এক একজন বীর্যবান ব্যক্তি বাংলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উচ্চতরস্থানে উন্নীত করে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। 'বিদ্যাসাগর'—যার মানে হল জ্ঞানের সমুদ্র—কথাটি ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সম্মানসূচক উপাধি। সংস্কৃতে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য কলকাতার পণ্ডিতেরা এই উপাধিটি ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যার সাগরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন করুণা, ঔদার্য এবং আরও অনেক গুণের সাগর, তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সবাই ছিল সমান। তিনি যেসব কাজ করেছিলেন তাতে ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না। একবার তাঁর একজন অধ্যাপকের কলেরা হলে তিনি নিজেই তাঁর শুশ্রূষা করেন। অধ্যাপকটি গরীব ছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র নিজ ব্যয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজেই রোগীর কাপড়চোপড় কেচেছিলেন।

তিনি চন্দননগরে নিজের পয়সায় লুচি-দই কিনে গরীব মুসলমানদের ভোজন করাতেন এবং যাদের প্রয়োজন তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। রাস্তার ধারে কোন পঙ্গু বা দুর্দশাগ্রস্ত লোককে দেখতে পেলে তিনি

তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন এবং নিজে তাঁর সেবা করতেন। অপরের দুঃখে তিনি দুঃখ পেতেন এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হতেন।

তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর পোশাক ছিল মোটা ধুতি, দেহ আচ্ছাদনের জন্য সেই জাতীয় একটি চাদর এবং একজোড়া চটি। এই পোষাকেই তিনি গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতেন এবং গরীবদের সম্ভাষণ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত ফকির, সন্ন্যাসী এবং যোগী।

তিনি দেখেন যে, বাংলা খুবই সুন্দর ভাষা, কিন্তু নতুন নতুন সংযোজনের অভাবে তাকে দরিদ্র ভাষা বলেই মনে হয়। সেজন্য তিনি বাংলা ভাষায় বই লিখতে আরম্ভ করেন। প্রধানত বিদ্যাসাগরের জন্যই বাংলা ভাষা আজ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন যে, কেবল বই লেখাটাই যথেষ্ট নয়। তাই তিনি অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরই হলেন কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এই কলেজের সমস্ত শিক্ষক হলেন ভারতীয়।

প্রাথমিক শিক্ষাও যে উচ্চতর শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় এই কথা উপলব্ধি করে তিনি গরীবদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। এটি ছিল এক বিশাল কাজ আর তার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, সরকার এই খরচ বহন করবেন। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড এডিনবারো এর বিরোধিতা করেন এবং বিদ্যাসাগর যে বিল পেশ করেছিলেন তা গৃহীত হয়নি। লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর এতে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বীর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, "মহাশয় নিজের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কখনো আদালতের শরণ নিইনি। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে আমি কি করে মামলা রুজু করব?" যেসব ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহায্য করতেন তাঁরা এই সময়ে তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তিনি নিজে খুব ধনী ছিলেন না। তাই অন্য লোকদের বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তবু তাঁর জন্য যখন জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলার প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি নাকচ করে দেন।

উচ্চতর এবং প্রাথমিক শিক্ষার এইভাবে সুদৃঢ় গোড়াপত্তন করে দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। তিনি দেখেন যে, মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে কেবল ছেলেদের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। তিনি মনু থেকে একটি শ্লোক বার করেন যাতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকেও কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'অত্যাবশ্যক সেবা' এই বিষয়ে তিনি একটি বই লেখেন এবং

মিঃ বেথুনের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা মেয়েদের কলেজে নিয়ে আসাটা খুবই শক্ত কাজ ছিল। সেজন্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে তিনি মিলিত হন এবং তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের কলেজে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিদ্যালয়ে বিনাপয়সায় খাদ্য, বস্ত্র এবং বই দেওয়া হত। এর পরিণামে এখন কলকাতায় হাজার হাজার শিক্ষিতা স্ত্রীলোক দেখতে পাওয়া যায়।

শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের স্থাপনা করেন।

হিন্দু বিধবাদের অবস্থা দেখে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থন করেন। এই বিষয়ে তিনি বই লেখেন এবং বক্তৃতা দিতে থাকেন। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণেরা তাঁর বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেন না। লোকেরা তাঁকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান। তিনি অনেক লোককে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁদের বালবিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের ছেলেকেও একজন গরীব বিধবাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন।

কুলীন ব্রাহ্মণদের অনেক স্ত্রী থাকত। এই সব মেয়েদের দুর্দশা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুমোচন করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কু-প্রথা দূর করার জন্য প্রয়াস করে গিয়েছিলেন।

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, বাংলা কিভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীরাই কবিতা ও সঙ্গীতের অনুরাগী। রামমোহন রায়ের পরে বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাঙালীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। দাতা, করুণা, বিদ্যাবত্তা এবং পরোপকারের দিক হতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তার অবদান অসামান্য। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি। তিনি তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে একজন বিধবার বিবাহ দেন। কৌলিন্য প্রথারও তিনি বিরোধী ছিলেন।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। পিতার নাম কাবা গান্ধী, মাতা পুতুলীবাঈ। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজী ও গুজরাটী ভাষায় লেখা। তিনি দার্শনিক ও রাজনীতিক। অনুবাদক ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা দেশ, বাঙালী ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তি লক্ষ্যণীয়।

শব্দার্থ ঃ অন্তর্ভুক্ত—অন্তর্গত। অস্বীকার—মানতে রাজী না হওয়া। উত্থান-পতন—জাগরণ ও বিনাশ। বীর্যবান—বীরপুরুষ। উন্নীত করে দিয়েছেন—উঠিয়ে দিয়েছেন। সম্মানসূচক—সম্ভ্রম প্রকাশক। ঔদার্য—উদারতা। ভেদাভেদ—পার্থক্য। প্রয়োজন—দরকার। ফকির—সংসার ত্যাগী মুসলমান। উৎকর্ষতা—সমৃদ্ধি। শরণ—ঠাঁই। সহায়তা—সাহায্য। গোড়াপত্তন—সূচনা। অত্যাবশ্যক—অতি প্রয়োজনীয়। পুণর্বিবাহ—আবার বিয়ে দেওয়া। অশ্রুমোচন—চোখের জল ফেলা। কু-প্রথা—খারাপ রীতি বা সামাজিক কানুন।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবত্তা, দয়া, সাহিত্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন, সেটা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর কি কি করেছিলেন ?

৩। বিদ্যাসাগর কিরূপভাবে জীবন যাপন করতেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **বাংলা দেশের মধ্যেই……পাওয়া যাবে না।**

(ক) কোন্ রচনার অংশ ? (খ) লেখক কে ? (গ) বাংলা দেশ ভারতের অংশ অথচ বাংলা দেশের মধ্যে ভারতকে পাওয়া যাবে কেন ?

২। **আমি যদি গান……বাংলাদেশে।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত ? (খ) লেখক কে ? (গ) এরূপ উক্তি কি যথার্থ বলে তোমার মনে হয় ?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **বাংলা ভারতবর্ষের অন্যান্য……হয়ে গিয়েছে।**

(ক) উক্তিটি কে, কোন্ গদ্যাংশে করেছেন ? (খ) কেন এরূপ বলেছেন ?

২। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।" —(ক) লেখক কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন ? (খ) তাঁদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কি কি ?

২। বিদ্যাসাগর গরীব মুসলমানদের কি কিনে খাওয়াতেন।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** ভারতবর্ষ, জাতি, বীর্যবান, করুণা, ঔদার্য, দুর্দশাগ্রস্ত, প্রকৃত, শিক্ষা, অনুভব।

২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** ডাক্তার, অস্বীকার, হিন্দু, সন্ন্যাসী, আনন্দে, সুন্দর, উৎকর্ষতা, অত্যাবশ্যক, বিরোধিতা।

৩। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** অন্তর্ভুক্ত, বিদ্যাসাগর, বিদ্যালয়, যথেষ্ট, অত্যাবশ্যক।

মৌখিক প্রশ্ন

১। রামমোহন রায় কেন বিখ্যাত ?

২। বিদ্যাসাগর কি—পদবী না উপাধি ?

৩। পঙ্গু কাদের বলা হয় ?

৪। বিদ্যাসাগরের পোশাক কি ছিল ?

৫। মামলা কি ?

৬। কে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করেন ?

৭। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে কার বিয়ে দিয়েছিলেন ?

৮। চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় অবস্থিত ?



পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে, সতীশ, এবেলা আবার বেগুন খেতে আছে নাকি— বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমোতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই! না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙা—ছল্ ছল্ করছে—বলি জ্বরটর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে, এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেছি তাই। এই যে, বেশ গা গরম হয়েছে—এমন সব ছেলের হাত পা বেঁধে জল-বিছুটি দিলে তবে রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদায় করে তবে আমার আর কাজ? চল্ ঘরে, গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া! বলিয়া তিনি বার্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীর-কণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন—স'তে! পিসিমা অত্যন্ত রাশ-ভারী লোক। বাড়ীসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কখনও, কোন কারণেই, তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালোবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন,—তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব। বেহায়া, নিজে ফিবছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে! কেউ পড়ুক, না পড়ুক কারুকে তুই জিজ্ঞাসা পর্যন্ত কর্‌তে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি 'দম' লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, একঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে আমরা আর কেয়ার করব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোড়দাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হলো তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা তোমার কালের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা, তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য

অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়। মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয় বস্তুটিকেও অসংকোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। রবিবারে দুপুর-রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাহার তাস খেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার। অথচ 'না' বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও,—একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ শ্রীকান্ত সারারাত ইন্দ্রনাথের সংগে কাটিয়ে সকালে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে পিসিমা তাকে দেখে রেগে-মেগে অস্থির। কিন্তু তিনি শ্রীকান্তের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন জ্বর-জ্বর ভাব। শরীরে উত্তাপও যথেষ্ট। তিনি তাকে তার ঘরে আটকে রাখার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। মেজদা হুংকার ছাড়লেন। কিন্তু পিসিমার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে চুপ করতে বাধ্য হলেন। মেজদা নিজে ফি-বছর ফেল করেন। অথচ ছোটদের ওপর কর্তৃত্ব করেন। পিসিমা শ্রীকান্তকে নিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দরজার শিকল আটকে চলে গেলেন। একবার কিছু গরম জিলিপিও খাওয়ালেন। কিছুক্ষণ বাদে শিকল খুলে প্রথমে যতীনদা ও পরে ছোড়দা এল। দুজনেই আনন্দে আত্মহারা। কারণ পিসিমা আদেশ দিয়েছেন যে এখন থেকে মেজদা আর তাদের পড়াশুনায় কর্তৃত্ব করবে না। তারা মেজদার কাছে পড়বে না—আলাদা ঘরে পড়তে বসবে। এক সময়ে মেজদা তার ছোট ভাইদের ওপর নানাভাবে দৌরাত্ম করতেন। সুতরাং মেজদার শাসন মুক্ত হয়ে তিন ভাই স্বাধীনতার মূল্য যে কী অপরিসীম—সেটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেল। সকলেই তাই আনন্দে মশগুল হয়ে উঠল।

লেখক-পরিচিতি ঃ হাওড়া জেলার দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতার

নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক 'শ্রীকান্ত,' 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'দেনা পাওনা' তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। এই অংশটি তাঁর শ্রীকান্ত (১ম) উপন্যাসের অন্তর্গত।

শব্দার্থ ঃ পাঁজি—পঞ্জিকা। অবাক্—বিস্মিত। আগাইয়া—অগ্রসর হয়ে। বার্তাকু—বেগুন। জলদগম্ভীর-কণ্ঠে—মেঘের গর্জনের মত গলার স্বরে। উপক্রম—উদ্যোগ। হাতছাড়া—নাগালের বাইরে যাওয়া। খবরদার—সাবধান। চাহনি—দৃষ্টি। বেহায়া—নির্লজ্জ। ফিবছর—প্রতি বছর। আতিশয্যে—বাহুল্যে। ফিস্‌ফিস—চুপচাপ। অধীর—ব্যাকুল। ন্যায়—ন্যায় সংগত। অসঙ্কোচ—সঙ্কোচ না করে। তৎক্ষণাৎ—সেই মুহূর্তে। আশ্চর্যের—বিস্ময়ের।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ঘরে ঢুকে শ্রীকান্তকে দেখতে পেয়ে পিসিমা রেগে গেছলেন কেন? পরে তিনি তাকে তার ঘরে শুইয়েই বা কেন দিয়েছিলেন?

২। পিসিমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল?

৩। মেজদার স্বভাব কেমন ছিল? সে তার ছোট ভাইদের ওপর কিরূপ দৌরাত্ম করত?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **এমনি মানুষের……আনন্দ।**

(ক) কোন্ গদ্যাংশে আছে? (খ) লেখক কে? (গ) উক্তিটির তাৎপর্য নির্দেশ কর।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **বস্তুতঃ মেজদার……সীমা ছিল না।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কার লেখা এবং কোন্ গদ্যাংশে আছে? (খ) এখানে কি কি অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে?

২। **'খবরদার। যাসনে বলছি শ্রীকান্ত'**

—কে, কখন, কাকে এবং কেন একথা বলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। শ্রীকান্ত সারা রাত কার সংগে ছিল?

২। যতীনদাকে ছোড়দা কলের লাট্টুটা দিয়ে দিল কেন?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **চলীত ভাষায় পরিবর্তন কর ঃ** পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে,

সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে নাকি—বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

২। **বাক্য গঠন কর ঃ** হতভাগা, জলদগম্ভীর-কণ্ঠে, উপক্রম, বাড়িসুদ্ধ, বেহায়া, ফিস্‌ফিস, আন্দোলিত, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, ফি-বছর, দিবানিদ্রা, ঘুণাক্ষরে, রাশ-ভারী।

৩। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** আগাইয়া, প্রবেশ, বাহির, আনন্দ, অসঙ্কোচে, সীমা, কাজ, প্রশ্ন।

৪। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** শিকার, ধনি্য, হতভাগা, সংক্ষেপ, সাবধান, ঘর, পৃথিবী, ব্যক্তিগত, ন্যায্য।

মৌখিক প্রশ্ন

১। ইন্দ্র কে ?

২। জ্বরের লক্ষণ কি ?

৩। বার্তাকু কি ?

৪। ফি-বছর কথাটির মানে কি ?

৫। মেজদা গরমের দিনে ঘুমোবার সময় ছোট ভাইদের কি আদেশ দিতেন ?

৬। মেজদার নাম কি ?



মেরী স্কল্‌ডোয়াস্কা কুরী ১৮৬৭ সালে পোলাণ্ডের ওআরস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওই শহরের এক স্কুলে বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, শিক্ষককেই অনেক সময় নিজের পয়সায় বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কিনে নিতে হত। মেরী দিনের বেলায় স্কুলে যেত আর সন্ধ্যার সময় পরীক্ষাগারে এসে তার বাবাকে সাহায্য করত,—টেস্টটিউব ধুত, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করত। স্কুল ত্যাগ করার পর তিনি কয়েক বছর নিকটবর্তী এক ধনীর সন্তানদের গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত হয়ে অল্প কিছু করে উপার্জন করতে থাকলেন। শেষে ১৮৯১ সালে প্যারিস অভিমুখে রওনা হলেন, নিজের কর্মশক্তি ও ধীশক্তি ছাড়া কোন সম্বল সঙ্গে রইল না। প্যারিসে সবচেয়ে দরিদ্রেরা যে অংশে বাস করত, তিনি সেখানে একটা অতি ছোট ঘরে আশ্রয় নিলেন, আহার একেবারে সাধারণ ও অপ্রচুর; ফলে শরীর জীর্ণ হতে থাকল। প্রথমে একটি রসায়নাগারে উনান ধরান, টেস্টটিউব পরিষ্কার করার কাজ নিলেন, কিন্তু কর্মপটুতায় অল্পকালের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সুবিধে পেলেন। এই সময় পিরী কুরী পদার্থবিদ্যায় কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, স্বল্পবেতনে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। মেরী বিজ্ঞানের অনেক বিষয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। ১৮৯৫ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তখন তাঁরা এতই গরীব যে বাড়ীর কাজকর্ম করার জন্যে একজনও চাকর ছিল না, অধ্যাপক কুরী ঘর ঝাঁট দিতেন, ম্যাডাম কুরী রান্না করতেন।

যে বছর তাঁদের বিয়ে হল সেই বছর রন্‌টগেন এক্‌স-রশ্মি আবিষ্কার করেন, আর পরের বছর বেকারেল ইউরেনিয়ম থেকে এক্‌স-রশ্মির অনুরূপ তেজ লক্ষ্য করলেন। কুরী দম্পতি বেকারেলের এই গবেষণায় আকৃষ্ট হলেন, ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য কোন পদার্থ থেকে অনুরূপ তেজ বেরয় কিনা সে

সম্বন্ধে ম্যাডাম কুরী অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন কিন্তু পরীক্ষাগার বলে তিনি কিছুই পান নি, একটা ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেতে গুদাম ঘরের একটা অংশ জোড়াতাড়া দিয়ে কয়েকটি যন্ত্র খাড়া করে তিনি তার গবেষণা শুরু করলেন।

ইউরেনিয়ম পাওয়া যাচ্ছিল পিচব্লেণ্ড নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে। ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করলেন যে, পিচব্লেন্ড থেকে ইউরেনিয়ম বের করে নেবার পর যা বাকি থাকে, আর এতদিন যাকে অকেজো বলে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, সেই পরিত্যক্ত অংশের তেজ ইউরেনিয়মের তেজের অনেকগুণ বেশী। এই সময় অধ্যাপক কুরী এই কাজে যোগ দিলেন। কুরী দম্পতি ভাবলেন যে পিচব্লেণ্ডে এমন কোন অনাবিষ্কৃত পদার্থ আছে যা ইউরেনিয়মের অনেকগুণ বেশী তেজস্কর। এই নতুন পদার্থের আবিষ্কারে তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। কিন্তু এর জন্যে বহু পরিমাণে পিচব্লেণ্ড চাই, তা কেনবার পয়সা তাঁদের নেই। অষ্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট দয়া পরবশ হয়ে বোহিমিয়ার এক খনি থেকে তোলা এক টন পিচব্লেণ্ড কুরী দম্পতিকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তাঁরা এক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত রইলেন। কি করে ওই শক্ত পদার্থ থেকে তাঁদের কল্পিত ওই নতুন পদার্থটিকে বের করা যেতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে লাগল। প্রথমে তাঁরা এক নতুন পদার্থ পেলেন যা ইউরেনিয়মের চেয়ে কিছু বেশি তেজস্কর। ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি ছিল পোলাণ্ড। তিনি তাঁর দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই পদার্থের নাম দিলেন পলোনিয়ম।

কিন্তু পলোনিয়ম বের করে নেবার পরও দেখা গেল যে আগের তেজ প্রায় সমানই রইল। তা হলে পলোনিয়ম ছাড়া অন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে সমান ভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে লাগল, অদম্য উৎসাহে কুরী দম্পতি তাঁদের সাধনায় মগ্ন রইলেন। শেষে ১৯০২ সালে তাঁরা রেডিয়ম বলে এক নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়, রেডিয়াম ক্লোরাইড রূপে। দেখা গেল, এই বস্তু সমপরিমাণ ইউরেনিয়মের প্রায় লক্ষ গুণ বেশি তেজস্কর। কুরীরা চার বছর পরিশ্রমের পর একটন পিচব্লেণ্ড থেকে এক গ্রামের আট ভাগের একভাগ মাত্র রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন, তাও অবিশুদ্ধ অবস্থায়। কুরীদম্পতিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ মেরী স্কলডোয়াস্কা কুরীর জন্ম ১৮৬৭ সাল। জন্মস্থান পোলাণ্ডের ওআরস নগর। তাঁর বাবা ছিলেন এক স্কুলের বিজ্ঞান ও

গণিতের শিক্ষক। সেজন্য ছোটবেলা থেকেই মেরী কুরীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে। ১৮৯১ সালে তিনি প্যারিসে গিয়ে একটি রসায়নাগারে উনান ধরান, টেস্ট টিউব পরিষ্কার করার কাজ নেন। সেখানে তিনি পদার্থবিজ্ঞানী পিরী কুরীর সংস্পর্শে আসেন ও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মেরী পিরী কুরীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় পিচব্লেন্ড নামক খনিজ পদার্থ থেকে প্রথমে তেজস্ক্রিয় পলোনিয়ম ও পরে ১৯০২ সালে রেডিয়ম নামে মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কুরী দম্পতিকে এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনাভিতে লেখকের জন্ম। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি সহজ, সরল। মেরী কুরী রচনাটি লেখকের 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' হতে গৃহীত।

শব্দার্থ ঃ আর্থিক—অর্থনৈতিক। ধীশক্তি—প্রখর বুদ্ধি। সম্বল—অবলম্বন। দরিদ্র—গরীব। অপ্রচুর—খুব কম। স্বল্প বেতনে—কম মাইনেতে। কর্ম পটু—কাজে দক্ষ। অনুসন্ধান—খোঁজ। অনাবিষ্কৃত—যার আবিষ্কার হয়নি। ব্যাপৃত—লিপ্ত। তেজস্কর—অধিকতর তেজ সম্পন্ন।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। মেরী কুরী বৈজ্ঞানিক সাধনার কাহিনী লেখ।

২। রেডিয়ম কি ? এর আবিষ্কারের ইতিহাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। "তিনি তার দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই পদার্থের নাম দিলেন পলোনিয়ম।"

(ক) তিনি কে ? (খ) তাঁর দেশের নাম কি ? (গ) পলোনিয়ম নামকরণ হয়েছে কেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। বেকারেল কি লক্ষ্য করেন ?

২। কুরী দম্পতি কেমন করে পিচব্লেন্ড পেয়েছিলেন ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** উপার্জন, রসায়নাগার, গবেষণা, আবিষ্কার, তেজস্কর, পরীক্ষাগার।

২। **লিংগ পরিবর্তন কর ঃ** শিক্ষক, গৃহশিক্ষয়িত্রী, জন্মভূমি, বাবা।

৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** আর্থিক, দরিদ্র, কর্মপটু, আলোচনা, খনিজ, তেজ, শক্তি, শ্রদ্ধা, আবিষ্কার, শরীর।

মৌখিক প্রশ্ন

১। মেরী কুরীর পুরো নাম কি ?

২। বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা শিক্ষা লাভ করে ?

৩। রসায়নাগারে কি করা হয় ?

৪। পদার্থবিদ্যা বলতে কি বোঝ ?

৫। একস্-রশ্মির আবিষ্কারক কে ?

৬। কুরী দম্পতি কোন্ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ?

৭। ইউরেনিয়ম কি ?

—



সাত বৎসর পর আমি পুনরায় কারাগারে ফিরিয়া আসিলাম ; কারা-জীবনের পূর্বস্মৃতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেনট্রাল জেল অন্যতম বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃসঙ্গ কারাবাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে ২৩০০ জন কয়েদী হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা হইল। পনের ফিট উঁচু বৃত্তাকারে ঘেরা স্থানে, পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মধ্যস্থলে এক বিবর্ণ, কুৎসিৎ, চারিটি সেল-ওয়ালা দালান। আমাকে পাশাপাশি দুইটি সেল দেওয়া হইল—একটি বাসের, অপরটি স্নানাগার রূপে ব্যবহার করিবার জন্য। অপর দুইটি সেল কিছুকাল খালি ছিল।

বাহিরের কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনার পর এখানে আসিয়া আমি নিঃসঙ্গ ও অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, প্রথম দুই-তিন দিন খুব নিদ্রা গেলাম। তখন গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আমি বাহিরে শয়ন করিবার অনুমতি পাইলাম। সেলের বাহিরে প্রাচীর ও দালানের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার খাটখানি শক্ত করিয়া শিকল দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, কি জানি আমি যদি উহা লইয়া পলাইয়া যাই অথবা যাহাতে আমি দেওয়াল টপ্‌কাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না পারি সেইজন্যই এই সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সারারাত্রি নানাবিধ চীৎকার চলিত। যাহারা প্রধান প্রাচীর পাহারা দিত সেই সকল কয়েদী-পাহারাদারেরা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সাঙ্কেতিক চীৎকার করিত, তাহাদের তীব্র প্লুতস্বর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দূরাগত বায়ুর মর্মধ্বনির মত বোধ হইত। ব্যারাকে কয়েদী-মেটরা, তাহাদের জিম্মায় নির্দিষ্ট কয়েদীদের চীৎকার করিয়া অবিরত গণনা করিত, এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত সব ঠিক আছে। জেল কর্মচারীরাও রাত্রে কয়েকবার করিয়া ঘুরিতেন, আমার ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের

সহিত উচ্চৈঃস্বরে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেন। অন্যান্য স্থান হইতে আমার সেল দূরে ছিল বলিয়া এই সকল স্বর অস্পষ্টভাবে শুনিতাম। এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুঝিতাম না। কখনও কখনও মনে হইত, যেন আমি অরণ্যের পার্শ্বে রহিয়াছি এবং কৃষকেরা চীৎকার করিয়া শস্যক্ষেত্র হইতে বন্যপশু তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বন্য-জন্তুরা সকলে মিলিয়া তাহাদের নৈশ ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছে।

চতুষ্কোণ অপেক্ষাও বৃত্তাকার আবেষ্টনীর মধ্যেই বন্দী জীবন অধিকতর দুর্বহ—ইহা আমার কল্পনা, না সত্যঘটনা, আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি। প্রলম্বিত কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইয়া তোলে। দিবাভাগে প্রাচীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাখে,—অতি সংকীর্ণ ক্ষুদ্র অংশ নীল বস্ত্রাবাস, বন্দীরা যাহাকে আকাশ বলে,—তাহার মধ্যে রূপালী পাল তুলিয়া মেঘ খণ্ডগুলি ভাসিয়া যাইতেছে। রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ঘিরিয়া ফেলে, মনে হয়, আমি যেন এক কূপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাখচিত আকাশের যে অংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকট আর বাস্তব থাকে না। গ্রহতারকার কৃত্রিম মানচিত্রের অংশ বলিয়া মনে হয়।

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেলের লোকেরা বলিত কুত্তাঘর। ইহা পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ভয়ংকর চরিত্রের আসামীদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্যই ইহা বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছিল। পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণদিগকে জেলখানায় স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীরের সম্মুখে কিছু দূরে গম্বুজের মত একটা ইমারৎ দেখিয়া আমি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিসটা দেখিতে একটা বৃহৎ খাঁচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মানুষ অবিরত চক্রাকারে ঘুরিতেছে। পরে বুঝিতে পারিলাম যে, উহা জল তুলিবার পাম্প, এক এক সঙ্গে ষোলজন করিয়া লোক লাগাইয়া জল তোলা হয়। মানুষের যেমন সবই অভ্যাস হইয়া যায়, আমিও তেমনিই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি সর্বদাই আমার মনে হইত, মানুষের শ্রমশক্তিকে এভাবে কাজে লাগান নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতা মাত্র। উহার দিকে তাকাইলেই আমার চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়িত।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ সাত বছর ব্যবধানে লেখক আবার নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে কারাবাস করেন। ২৩০০ জন বন্দীর মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা হয়। পনের ফুট উঁচু বৃত্তাকারে ঘেরা স্থান, পরিধি

প্রায় একশত ফিট। এরই মাঝে চারখানি, বিবর্ণ কুৎসিত দালান। তারই দুটো সেল লেখককে দেওয়া হয়। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকতেন। গ্রীষ্মকালে তাঁকে বাইরে শোবার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন তিনি খোলা আকাশের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। তার কানে আসত কয়েদী, ওয়ার্ডার ও জেল কর্মচারীদের চীৎকার। লেখক যে সেলে কারাবাস করছেন তার নাম কুত্তাঘর। এক সময় ভয়ংকর কয়েদীদের এখানে আটকে রাখা হত। এখন রাজবন্দীরা যোলজন কয়েদী টানা জল তোলা পাম্প দেখে লেখক বিস্ময়ে অভিভূত হন।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল নেহেরু, মাতা স্বরূপরাণী দেবী। লেখক রাজনীতিক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। রচনাটি তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থের অংশ। ইংরাজী হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শব্দার্থ ঃ কারাগারে—জেলে। নিঃসঙ্গ—সঙ্গহীন, একা। বৃহৎ—বড়। বিবর্ণ—রং চটা। কুৎসিত—কদাকার। কর্মব্যস্ততা—কাজের চাপ। সংকীর্ণ—সরু। পরস্পরকে—একে অন্যকে। প্লুত—দীর্ঘস্বর। উচ্চৈঃস্বরে—খুব জোরে চীৎকার করে। শস্যক্ষেত্র—ধানের ক্ষেত। অরণ্য—বন। কৃত্রিম—অস্বাভাবিক। স্বতন্ত্রভাবে—আলাদাভাবে। নির্বুদ্ধিতা—বুদ্ধিহীনা, বোকামি।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। লেখক নৈনী জেলের যে সেলে বন্দী থাকতেন তার বর্ণনা দাও।

২। লেখক গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কিভাবে কাটাতেন?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **কখনও কখনও মনে……ঐকতান জুড়িয়া দিয়াছে।**

(ক) কোন্ রচনার অংশ? (খ) লেখক কে? কোন্ প্রসঙ্গে ও কেন লেখক এরূপ বলেছেন?

২। **"তথাপি সর্বদাই……কথা মনে পড়িত।"**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত? (খ) রচয়িতা কে?

(গ) কোন্ প্রসঙ্গে ও কেন লেখক এরূপ মন্তব্য করেছেন?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** কারাগার, স্নানাগার, নিরানন্দ, বস্ত্রাবাস, সংকীর্ণ, পরস্পর।

২। **বাক্য গঠন কর :** পৃথক, বৃত্তাকার, চতুষ্কোণ, সাবধানতা, সাঙ্কেতিক, নিরানন্দ, বর্বরতা, বিশেষভাবে।

৩। **বিপরীত শব্দ লেখ :** বৃহৎ, কুৎসিত, সংকীর্ণ, অস্পষ্ট, ইমারৎ, নির্বুদ্ধিতা।

৪। **পদ পরিবর্তন কর :** ব্যবহার, সংকীর্ণ, সাঙ্কেতিক, দীর্ঘ, অরণ্য, তৃষিত, মেঘ, আকাশ, রূপালী, রাজনৈতিক।

মৌখিক প্রশ্ন

১। লেখক কয় বছর ব্যবধানে নৈনী জেলে বন্দী হয়ে যান ?
২। কয়েদী কাদের বলে ?
৩। প্রত্নতত্ত্ব কি ?
৪। কুত্তাঘর কি ?
৫। ঐকতান বলতে কি বোঝায় ?

—



ভারতের মধ্যে বাংলাদেশেই জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিতেছিল, সেজন্য বাঙালী জাতিকে দুর্বল করিবার জন্য সেসময়ের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহার ফলে বাংলাদেশে যে আন্দোলন হইল তাহার নাম স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ইহার একটি অঙ্গ ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের উন্নতিসাধন। দেশময় জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে সভাসমিতি হইতে লাগিল, উদ্দীপক সাহিত্য ও সংগীতের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনকে দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার প্রতিক্রিয়ায় একদল যুবক বোমা তৈয়ারী এবং গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকিল। এই যুবকদল ধরা পড়িল এবং তাহাদের কঠোর দণ্ড হইল।

আন্দোলন ইহাতে মন্দীভূত হইল না। তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ আবার দ্বিখণ্ডিত বাংলাদেশকে পুনর্মিলিত করিয়া দিলেন। আন্দোলন কিন্তু চলিতে লাগিল। ক্রমে বাংলার আন্দোলন সারা ভারতের আন্দোলন হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইল—এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে। তিনি বলিলেন—প্রবল ইংরাজ জাতির সহিত সংগ্রামে হিংসার আয়ুধ ব্যর্থ। তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করিলেন। দেশবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। তাহার পর হইতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারা ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণে গঙ্গাধারার ন্যায় মহাত্মার নেতৃত্বে চলিতে লাগিল। জাতীয় মহাসমিতির কর্মধারা ও মহাত্মার প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করিল।

মহাত্মা অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ-নীতির পুষ্টিসাধনের জন্য যে বিধানগুলি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেগুলিও স্বাধীনতা সমরের এক একটি আয়ুধ। সেগুলি এই—অহিংস আইন লঙ্ঘন, বিলাতী পণ্যবর্জন, সরকারী চাকরী ও উপাধিবর্জন, কায়মনোবাক্যে অহিংসা ধর্মপালন, প্রাদেশিকতা ও

সাম্প্রদায়িকতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিসাধন, পতিত, উপেক্ষিত ও হরিজনগণের সমাজে মনুষ্যত্বের মর্যাদাদান, অকাতরে সর্ববিধ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বরণ ইত্যাদি। মহাত্মা তামসিকতায় আচ্ছন্ন দেশকে সাত্ত্বিকতার পথে স্বাধীনতার সাধনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি নিজে অশেষ নিগ্রহ লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুবর্তী সাধকগণও দুর্বিসহ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার দান অসামান্য। বাংলাদেশে মহাত্মার প্রতিনিধি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করিয়া মহাত্মা প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগ দেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মহাত্মার অনুবর্তন করিতে পারেন নাই। স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করিয়া তিনি অন্যপথে মুক্তির সন্ধান করেন।

সুভাষচন্দ্রের শেষজীবনের কাহিনী রোমান্টিক নাটকের শেষ অঙ্কের ন্যায় চমকপ্রদ। তিনি যখন আইন লঙ্ঘনের অপরাধে স্বগৃহে নজরবন্দী তখন মহাযুদ্ধ ভারতের পূর্বদ্বারে আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না! তিনি একদিন ছদ্মবেশে কাবুল হইয়া জার্মানীতে পলায়ন করিলেন। পূর্ব এশিয়া তখন জাপান অধিকৃত। এই অঞ্চলে যে সকল ভারতীয় প্রবাসী ছিল এবং যে সকল ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আর দেশে ফিরিতে পারে নাই, তাহাদের লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি বাহিনী গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র হন তাহার নেতা। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। আমেরিকানদের আবির্ভাবে ও উপকরণের অভাবে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। সুভাষচন্দ্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস স্বাধীনতা লাভের পথে আমাদিগকে অনেকদূর আগাইয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ভারতের মধ্যে বাঙালীর জাতীয়তাবোধ খুবই প্রবল। বড়লাট লর্ডকার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়। বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের উন্নতি সাধন ছিল এর লক্ষ্য। অন্যদিকে একদল যুবক বোমা তৈরী ও গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালায়। তাহাদের অনেকে ধরা পড়ল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। বাংলার আন্দোলন সারা ভারতের আন্দোলনে পরিণত হল। রাজ-নীতির ক্ষেত্রে অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। মহাত্মার

নেতৃত্বে অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর শিষ্য সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অসামান্য। সুভাষচন্দ্রের নজরবন্দী অবস্থায় অন্তর্ধান, জাপান অধিকৃত ভারতীয় বন্দী সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও মণিপুর পর্যন্ত বিজয় অভিযান চালানো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো দুর্বার করে তোলে।

লেখক পরিচিতিঃ ১৮৮৯ সালে বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে জন্ম। কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবে তিনি বিখ্যাত।

শব্দার্থঃ প্রখর—প্রবল। দুর্বল—বলহীন। অংগ—অংশ। দেশময়—সারা দেশে। উদ্দীপনা—যা উদ্দীপনা সঞ্চার করে। বর্জন—পরিত্যাগ। মন্দীভূত—ক্রমশ কমে আসা। পুনর্মিলিত—নতুন করে মিলন সাধন। দ্বিখণ্ডিত—দুই টুকরো। আন্দোলন—সংগ্রাম। সত্যাগ্রহ—সত্যের প্রতি অনুরাগ। অসহযোগ—সহযোগিতা না করা। আয়ুধ—অস্ত্র। আহ্বানে—ডাকে। কায়মনোবাক্যে—সর্বান্তকরণে। নিগ্রহ—নির্যাতন। লঙ্ঘন—অমান্য। প্রবাসী—যে বিদেশে থাকে। আত্মসমর্পণ—স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। স্বদেশী আন্দোলন কখন ও কিভাবে গড়ে ওঠে? এই আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল?

২। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৩। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে যা জান লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **তাহার পর হইতে……চলিতে লাগিল।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ প্রবন্ধের অংশ? (খ) রচয়িতা কে? (গ) শঙ্খধ্বনির অনুসরণে গঙ্গাধারা বলতে কোন্ কাহিনীর ইঙ্গিত করা হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল?

২। আজাদ হিন্দ ফৌজ কেন আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **বাক্য গঠন কর ঃ** উন্নতি সাধন, পুনর্মিলিত, আন্দোলন, অকাতরে, অসামান্য, কারাবরণ।

২। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** দুর্বল, স্বদেশী, ব্যর্থ, আবির্ভাব, অহিংস, অসহযোগ, মর্যাদা।

৩। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** দুর্বল, পুনর্মিলিত, আবির্ভাব, সত্যাগ্রহ, কায়মনোবাক্যে, দুর্বিসহ।

মৌখিক প্রশ্ন

১। লর্ডকার্জন কে ছিলেন ?

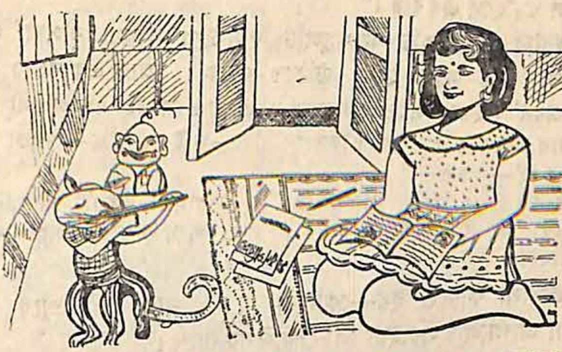
২। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা কে ছিলেন ?

৩। কাবুল কোথায় ?

৪। সুভাষচন্দ্র কিভাবে পলায়ন করেন ?

রাণুর বানান শেখা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়



বই হারানো কি ছেঁড়া, পেট-কামড়ান, মাথা-ব্যথা, খোকাকে ধরা ব্যাপারগুলো যখন অনেকদিন তাহাকে বাঁচাইবার পর নিতান্ত একঘেয়ে এবং শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখন দু'এক দিনের জন্য নেহাত বাধ্য হইয়া রাণু বই শ্লেট লইয়া হাজির হয়। অবশ্য পড়াশুনা কিছুই হয় না। প্রথমে গল্প জমাইবার চেষ্টা করে। সংসারের উপর কোন কিছুর জন্য মনটা খিঁচড়াইয়া থাকায়, কিংবা অন্য কোন কারণে যদি সকলের নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে আমার মনটা বেশী রকম সজাগ থাকে তো, ধমক খাইয়া বই খোলে। সেটা রাণুর পাঠাভ্যাস কি আমার ধৈর্য, বাৎসল্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরীক্ষা তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন।

আড়াইটি বৎসর গিয়াছে, ইহার মধ্যে রাণু 'অজ', 'আম'র পাতা শেষ করিয়া 'অচল', 'অধম'-র পাতায় আসিয়া অচল হইয়া বসিয়া আছে। বই খুলিয়া আমার পানে চায়, অর্থাৎ—বলিয়া দিতে হইবে। আমি প্রায়ই পড়াশুনার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র উপদেশ দিয়া আরম্ভ করি—"আচ্ছা রাণু, যদি পড়াশুনা না কর তা বিয়ে হলেই যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে, মেজকাকা কি রকম আছে, তাকে কেউ সকালবেলায় চা দিয়ে যায় কিনা, নাইবার সময় তেল, কাপড়, গামছা দিয়ে যায় কি না, অসুখ হলে কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কি না—এসব কি করে খোঁজ নেবে ?"

রাণু তাহার মেজকাকার ভাবী দুর্দশার কথা কল্পনা করিয়া একটু মৌন থাকে, কিন্তু বোধহয়, প্রথমভাগ—পারাবার পার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বলে'—আচ্ছা মেজ্‌কা, একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না ?—আমায় একটুও বলে দিতে হবে না। ঐ ক'য়ে য-ফলা "……রাগিয়া বলি—"ঐ জন্যই তোমার কিছু হয় না। নাও, পড়,—সেদিন কতদূর হয়েছিল——'অচল' শেষ করেছিলে ?"

রাণু নিষ্প্রভভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানায়—"হাঁ" ;

বলি—"বল তা'হলে একবার।"

'অচল' কথাটার উপর কচি আঙ্গুলটি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। —আমার মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিতে থাকে। আজ এক বৎসর ধরিয়া এই 'অচল', 'অধম' লইয়া কসরত চলিতেছে; এখনও রোজই এই অবস্থা।

তবুও ক্রোধ দমন করিয়া গম্ভীরভাবে বলি—ছাই হয়েছে—আচ্ছা বল—'অ—চ—আর ল'—অচল—"

রাণু 'অ-এর উপর থেকে আঙ্গুলটা না সরাইয়া তিনটি অক্ষর পড়িয়া যায়। 'অধম' ও ঐ ভাবেই শেষ হয়; অথচ ঝাড়া দেড়টি বৎসর শুধু অক্ষর চেনায় গিয়াছিল।

তখন জিজ্ঞাসা করিতে হয়—কোন্‌টা অ?" রাণু ভীতভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া আঙ্গুলটি সরাইয়া 'ল'-য়ের উপর রাখে।

ধৈর্যের সূত্রটা তখনও ধরিয়া রাখি, বলি—"হু"; "কোন্‌টা 'ল' হ'ল তাহ'লে?"

আঙ্গুলটা সট করিয়া 'চ'য়ের উপর সরিয়া যায়। ধৈর্য সাধনা তখনও চলিতে থাকে; শান্তকণ্ঠে বলি—"চমৎকার।—আর 'চ'?"

খানিকক্ষণ স্থির ভাবে বইয়ের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার পর চলে—'চ'? 'চ' নেই মেজ্‌কা।

সংযত রাগটা অত্যন্ত উগ্রভাবেই বাহির হইয়া পড়ে, পিঠে একটা চাপড় কষিয়া বলি—"তা থাকবে কেন? তোমার ডেঁপোমি দেখে চম্পট দিয়েছে। ——হতভাগা মেয়ে রাজ্যের কথার জাহাজ হয়েছেন; আর এদিকে আড়াই বৎসর প্রথম ভাগের আড়াইটা কথা শেষ করতে পারলে না। কত বুড়ো বুড়ো গাধা ঠেঙিয়ে পাস করিয়ে দিলাম, আর এই একরত্তি মেয়ের কাছে আমায় হার মানতে হ'ল। কাজ নেই তোর অক্ষর চিনে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে বসে খালি 'অ চ আর ল-অচল', অ-ধ আর ম অধম', এই আওড়াবি—তোর সমস্ত দিন আজ খাওয়া বন্ধ।"

বিরক্তভাবে একটা খবরের কাগজ কিংবা বই লইয়া বসিয়া যাই। রাণু ক্রন্দনের সহিত সুর মিশাইয়া পড়া বলিয়া যায়।

বলি বটে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়িতে হইবে; কিন্তু চড়টা বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাই যে, সেদিনকার পড়া ঐ পর্যন্ত। রাণু এতক্ষণ চক্ষের জলের ভরসাতেই থাকে এবং অশ্রু নামিলেই সেটাকে খুব বিচক্ষণতার সহিত কাজে লাগায়। কিছুক্ষণ পরে আর পড়ার আওয়াজ পাই না, বলি—"কি হল?"

রাণু ক্রন্দনের স্বরে উত্তর করে—"নেই"।

"কি নেই"।—বলিয়া ফিরিয়া দেখি চক্ষের জল 'অচল', 'অধম'র উপর ফেলিয়া আঙুল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া কথাদুটো বিলকুল উড়াইয়া দিয়াছে—একেবারে নীচের দুই তিনখানা পাতার খানিকটা পর্যন্ত।

কিংবা আঙ্গুলের ডগায় চোখের ভিজা কাজল লইয়া কথা দুটিকে

চিরান্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছে ;—এইরূপ অবস্থাতে বলে—"আর দেখতে পাচ্ছি না মেজ্‌কা"—এই রকম আরও সব কাণ্ড।

চড়টা মারা পর্যন্ত মনটা খারাপ হইয়া থাকে, তাহা ভিন্ন ওর ধূর্তামি দেখিয়া হাসিও পায়। মেয়েদের পড়াশুনা সম্বন্ধে আমার মতটা ফিরিয়া আসে ; বলি—"না তোর আর পড়াশুনা হোল না রাণু, শ্লেটটা নিয়ে আয় দিকিনি—দেগে দি, বুলো, পিঠটায় লেগেছে বেশী ?—দেখি।"

রাণু বুঝিতে পারে তাহার জয় আরম্ভ হইয়াছে, এখন তাহার সব কথাই চলিবে। আমার কাঁধটা জড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকে—"মেজ্‌কা।"

উত্তর দিই—"কি ?"

"আমি মেজ্‌কা বড় হয়নি ?"

"তাতো খুব হয়েছো, কিন্তু কৈ—"

বাধা দিয়া বলে—"তা'হলে শ্লেট ছেড়ে ছোটকাকার মত কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসব ? চারটে ডট্‌পেন্সিল আছে আমার। শ্লেটে খোকা বড় হ'য়ে লিখবে'খন।" হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া বলে—"ও মেজ্‌কা তোমার দুটো পাকা চুল গো, সর্বনাশ ! বেছে দিই ?"

বলি—"দাও ? আচ্ছা রাণু এইতো বুড়ো হতে চললাম, তুইও দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ী চল্‌লি। লেখাপড়া শিখলি নি, মরলাম কি বাঁচলাম কি করে খোঁজ নিবি ?—আমায় কেউ দেখে শোনে কি না, রেঁধে—টেঁধে দেয় কিনা।—"

রাণু বলে—"পড়তে তো জানি মেজ্‌কা, খালি পেরথোম ভাগটাই জানি না—বড় হয়েছি কিনা। ঠাকুরদাও তো আর পেরথোম ভাগ পড়েন না মেজ্‌কা।"

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ছোট্ট মেয়ে রাণু। পড়াশুনায় সে বড্ড অমনোযোগী। পড়ার সময় তার নানা অজুহাত, নানা বায়না। প্রথম ভাগ শেষ করতেই তার কেটে যায় অনেকদিন। তার মেজকার রাগ হলেও কখনও মারতে হাত ওঠে না।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৮৯৯ সালে জন্ম। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সরস কাহিনী রচনায় অসামান্য দক্ষ। তিনি প্রধানতঃ গল্পকার। এটি একটি ছোট গল্প।

শব্দার্থ ঃ পেট কামড়ান—পেট ব্যথা। শক্তিহীন—দুর্বল। হাজির—উপস্থিত। দুর্দশা—খারাপ অবস্থা। নিষ্প্রভভাবে—নিরুত্তেজভাবে। অত্যা-

বশ্যকতা—অতি প্রয়োজনীয়তা। কসরত—কৌশল, কায়দা। বিলকুল—সমস্ত। শিহরিয়া—চমকাইয়া।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। 'রাণুর বানান শেখা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

২। রাণুর স্বভাব কি রকম ছিল? পড়তে বসে সে কি করত?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। 'আচ্ছা মেজ্‌কা একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়লে হয় না।'—কে, কখন, কাকে কথাগুলি বলেছে?

২। 'ও মেজ্‌কা তোমার দুটো পাকা চুলগো, সর্বনাশ'—কে, কখন, কাকে একথাগুলি বলেছিল? যাকে বলা তিনিই বা কি, উত্তর দেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। রাণু কে? কে তাকে পড়াত?

২। রাণু কখন বলত তার পেট কামড়াচ্ছে?

৩। ডেঁপোমি কি?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর:** পেট, দিন, সংসার, মন, রক্ত, ভীত, সহিষ্ণুতা, জল।

২। **বিপরীত শব্দ লেখ:** বেশী, হাজির, স্থির, ক্ষুদ্র, আবশ্যক, গরম।

৩। **বাক্য গঠন কর:** বিলকুল, বিরক্তভাবে, খিঁচড়াইয়া, নিষ্প্রভভাবে, কসরত।

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর:** পাঠ্যাভাস, অত্যাবশ্যক, দুর্দশা, চিরান্ধকারে।

মৌখিক প্রশ্ন

১। রাণু কখন গল্প জমাবার চেষ্টা করত?

২। কোন্ বইয়ের প্রথম ভাগ?

৩। 'কথার জাহাজ' কি?

৪। রাণু কখন ক্রন্দনের সুরে উত্তর দিত?

অমরনাথের পথে

প্রবোধ কুমার সান্যাল



আজ ২১শে আগস্ট ১৯৫৩। আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদারের জিম্মায় রাখা আছে। দুটি মালবাহী ঘোড়া আটত্রিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দুটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটি তাঁবু ছ' টাকা। খাটিয়া দু' টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধরে হেঁটে যাবে। সকলেই তারা কাশ্মীরের গ্রাম্য মুসলমান। এদিকে আমাদের তোড়-যোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গন্তব্যস্থল হোলো চন্দনবাড়ি। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিয়ে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহ্নের ঠিক পরেই যাত্রাকালে খবর পাওয়া গেল, দুটি ঘোড়া আমাদের নিরুদ্দেশ। তখনই ছুটোছুটি পড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত্র যাত্রা না করলে নির্দিষ্ট শ্রাবণী পূর্ণিমায় কোনো মতেই অমরনাথে পৌঁছানো যাবে না। অজানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোন ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা একবেলার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশূন্য তুষার প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপত্যকার মাঠে মাঠে বিপন্ন ভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম। ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের সুরাহা হোলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধরে রইলুম। দুর্গম তীর্থ পথের এই অকৃত্রিম বন্ধু কয়টিকে সকাল থেকে চোখের সামনে বেঁধে রাখলেই ভাল হতো। আমরা প্রত্যেকেই যেন স্বার্থ সচেতন হয়ে উঠেছি।

এবারে যাত্রী সংখ্যা কম। তবুও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত আটশো। এদের মধ্যেই আছে সাধু সন্ন্যাসী, আছে যোগী ফকির। কেদারবদরি অথবা কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত এখানে তেমন নয়। ওই একটি মাত্র দিন শ্রাবণী পূর্ণিমা! পৌঁছতে যদি পারো তবে যাও।

নেলে আবার আসছে বছর। এ-যাত্রায় সকলের আগে গেছে অমরনাথের পূজারীর দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আটাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পূজার উপকরণাদি, আছে শঙ্খঘণ্টা। এরা প্রতি বছর সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গুহায় পেঁছায়। মার্তণ্ড শহর থেকে ওরা প্রথম রওনা হয়—রাজ্য সরকার থেকে ওরা সাহায্য পায়।

আমরা প্রায় সকলের পেছনে পড়েছি। তবু এখনো অপরাহ্ন, আড়াইটে বোধ হয় বাজেনি। রৌদ্র বেশ প্রখর। মেঘ যদি না করে আমাদের অসুবিধা কিছু নেই। প্রথমটা পথ যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া যাওয়া অসুবিধা। শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তার নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তর পথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবন্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। আমাদের ঘোড়া চলছে সার বেঁধে। কেউ কেউ পাশ কাটিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন হয়ে এলো। আকাশ ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো ঝরো আওয়াজ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধুর। চড়াই পথে চলছি, কখনো নামছি, কখনো উঠছি। পাহাড়ের গা বেয়ে চলছি। পাশেই নীলগঙ্গার গভীর নীচু খাদ। দুই ধারে পর্বতমালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালয় পাওয়া যাচ্ছে, এখনও সুশ্রী বলিষ্ঠ আর্য-নাসা ও চক্ষুযুক্ত পার্বত্য স্ত্রী পুরুষকে মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একটু আধটু গ্রামের চিহ্ন—কোথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের সুদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘ বিলম্বিত বিরাটাকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো। নীলগঙ্গার অবিশ্রান্ত ঝরো-ঝরো আওয়াজ শুনতে শুনতে অশ্বারোহী যাত্রীর দল শান্তমনে পাহাড়ীপথ অতিক্রম করে চলেছে। ডাণ্ডি চলেছে বাঙ্গালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হেঁটে তরুণ দলের সঙ্গে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশু চলেছে ঘোড়ায়। এদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার দল। গাছের ডাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি ঘোড়সওয়ার—আশঙ্কায় কণ্টকিত কোমরের ব্যাথায় আড়ষ্ট। কখনো অজস্র বহুবর্ণ বন্য ফুলের গন্ধ, কখনো পতঙ্গদলের রঙ্গীন পাখার গুঞ্জন, কখনো বা অনামা পাখিদলের এপার থেকে ওপার যাবার ডানা চালনার আওয়াজ। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহসা সামনের দিক থেকে একটা কলরব ভেসে এলো পেছন দিকে। আমরা একটি নির্ঝরিণীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি

একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-পুরুষের দল যাচ্ছিল। তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খাদের দিকে পড়ে যান। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গে ক্ষত-চিহ্নগুলি রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন পড়ে রয়েছেন পথের উপর। আত্মীয়েরা অপেক্ষা করছেন আশেপাশে। 'ফার্স্ট এইড' দেওয়া হচ্ছে। কারণটা হলো সংকীর্ণ পথে ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কা লেগে খাদের দিকে তিনি ছিটকে পড়েন। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি। এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পায়ে চলার দাগ, আছে বড় বড় গাছ পাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কখনো মাথা হেঁট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপুড় হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথরের খোঁচা। কখনো ঘোড়ার পিঠে বসে হাটুতে লাগছে পাথরের ধাক্কা কিন্তু পা সরাবার উপায় নেই, ভারসাম্য রক্ষা হয় না। চোখ দুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে। উপর থেকে নীচে। যারা ডাণ্ডিতে চলেছেন চারটে মানুষের কাঁধে, তাদের পা দুটো কখনো উপর দিকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কখনো পা দুটো এত নীচে ঝোলে যে, ডাণ্ডি থেকে পিছলে না পড়ে যান। আমাদের পথ আজকের মত ফুরিয়ে এসেছে। দূর থেকে চন্দনবাড়ির অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন'মাইল পথ পেরিয়ে এলুম। সাড়ে ন'হাজার ফুটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ১৯৫৩ সালের ২১শে আগস্ট চারটি ঘোড়া এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে অমরনাথের উদ্দেশ্যে লেখক রওনা হন। সেদিনকার লক্ষ্যস্থল ছিল চন্দনপুর। দুজন অশ্বরক্ষী কাশ্মীরী গ্রাম্য মুসলমান হেঁটে চলেছিল। পথ বড়ই দুর্গম। শ্রাবণী পূর্ণিমায় যেভাবেই হোক অমরনাথে পেঁছিতে হবে। সাধু, সন্ন্যাসী ভ্রমণকারী মিলিয়ে পথ যাত্রীর সংখ্যা সাত-আটশ। ঘোড়ার পিঠে ভ্রমণকারীরা শান্ত মনে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে চলেছে। পদে পদে বিপদের আশংকা। ক্রমশঃ পথ অপ্রশস্ত হয়ে এসেছে। পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ নেই। অবশেষে সাত-আট মাইল পথ অতিক্রম করে চন্দনবাড়িতে পেঁছান।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লেখকের জন্ম। সাহিত্যিক ও

ভ্রমণকারী হিসেবে তিনি সুবিখ্যাত। রচনাটি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থ হতে গৃহীত।

শব্দার্থ ঃ ঠিকাদার—অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ এমন ব্যক্তি। জিম্মায়—হেফাজতে। গন্তব্যস্থল—যাবার নির্দিষ্ট স্থান। তোড়-জোড়—বন্দোবস্ত। মধ্যাহ্নে—দুপুরে। নিরুদ্দেশ—হদিশ মেলে না। জনশূন্য—যেখানে লোকজন নেই। দিগন্ত জোড়া—বহু দূর বিস্তৃত। আতঙ্কে—ভয়ে। দুর্গম—যেখানে সহজে গমন করা কঠিন। অকৃত্রিম—অন্তরঙ্গ। অবধি—পর্যন্ত। প্রসারিত—ব্যাপ্ত। অভিযাত্রী—নতুন কোন স্থান দেখা বা জয়ের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা করে। সংকীর্ণ—সরু। বলিষ্ঠ—স্বাস্থ্যবান। প্রাগৈতিহাসিক—ইতিহাস শুরু হবার পূর্বেকার। সরীসৃপ—যে প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে। যেমন—সাপ, টিকটিকি ইত্যাদি। ঘোড়সওয়ার—অশ্বারোহী।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। লেখক কিভাবে চন্দনবাড়ি যাবার বন্দোবস্ত পাকা করেন ?

২। চন্দনবাড়ি অধিত্যকায় পৌঁছাইতে লেখক যে দুর্গম পথ অতিক্রম করেন তার বর্ণনা দাও।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **দুর্গম তীর্থ পথের……স্বার্থ সচেতন হয়ে উঠেছি।**

(ক) কোন্ রচনার অংশ ? (খ) লেখক কে ? (গ) প্রসঙ্গনির্দেশপূর্বক 'স্বার্থ সচেতন হয়ে' ওঠার কারণ লেখ।

২। **আকাশ ছোট হয়ে……থেকে যাচ্ছি দেবলোকে।**

(ক) উদ্ধৃতিটি কোন্ গদ্যাংশের অন্তর্গত ? (খ) রচয়িতা কে ? (গ) উদ্ধৃতিটির বক্তব্য নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **"আমরা চলেছি ভূস্বর্গে"**—ভূস্বর্গে যাত্রাপথের যে বর্ণনা এখানে পাও লেখ।

২। **এই ঘটনার থেকে……করলো"**—(ক) ঘটনাটি কি ? (খ) কি শিক্ষা পাওয়া গেল ? (গ) অপঘাত বলিতে কি বোঝায় ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **বাক্য গঠন কর** ঃ মালবাহী, গন্তব্যস্থল, নির্বাসিত, আটাসোঁটা, শ্রেণীবদ্ধ, কলরব, ভারসাম্য।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** সোৎসাহে, দিগন্ত, সংকটাপন্ন, সংকীর্ণ, নিরুদ্দেশ।

৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** যাত্রী, শ্রাবণী, গ্রাম্য, সন্ন্যাসী, শহর, পাহাড়ী, পার্বত্য, তরুণ।

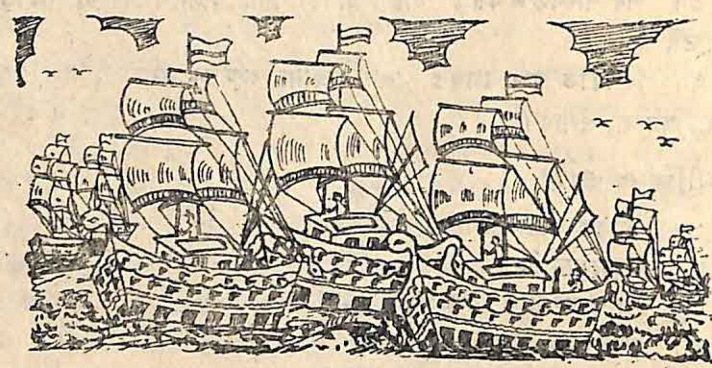
৪। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** শেষ, অজানা, অকৃত্রিম, সংকীর্ণ, বিরাট্‌কায়, শিশু, অনামা, এপার।

মৌখিক প্রশ্ন

১। ভূস্বর্গ কাকে বলে ?
২। ক্যারাভান কি।
৩। প্রাগৈতিহাসিক বলতে কি বোঝ ?
৪। চন্দনবাড়ি কি ?
৫। 'ফার্স্ট এইড' বলতে কি বোঝ ?
৬। পহলগাঁও কি ?

প্রাচীন বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য

নীহাররঞ্জন রায়



এ পর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে সব দ্রব্যাদির কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল অর্থাৎ আম, কাঁঠাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা হয় তো সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই। তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে এই সব জিনিস লইয়া ছোট খাট ব্যবসা বাণিজ্য চলিত বই কি। হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, হট্টবর, আপণ, মানপ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি রাজকর্মচারীর উল্লেখ হইতেও একটা সমৃদ্ধ অন্তর্বাণিজ্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। হাট বাজার, বাণিজ্যশুল্ক এবং পারঘাট-খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্ব ছিল ইহাদের উপর। প্রসংগ উল্লেখ হইতে মনে হয়, এই সব উপায় হইতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট অর্থাগম হইত। ছোট বড় নগরগুলিই এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই চলিত। এই সব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয় বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য যেমন পান, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই এবং শুধু বাংলাদেশের ভিতরেই নয় দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সুপারি ও নারিকেল এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানি হইত। বংশীদাসের মনসামংগলে ও কবিকংকণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগলে পাই, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ আছে। গুয়ার বদলে লইয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শংখ। গুবাকে ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত,

তাহার প্রমাণ তো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানীর আমলে সুপারি বাংলাদেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারি, নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে প্রাচীন বাংলার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক, নারিকেল এবং পানের বরজের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাংলাদেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। লবণও অন্যতম বাণিজ্য সম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ লইয়া আসিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি, কোম্পানীর সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতঃই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভজনক ছিল।

তেজপাতা ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল সন্দেহ নাই। রোম-সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধসের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, এই সব বাণিজ্যসম্ভার হইতে দেশে কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাংলাদেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাংলায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ, ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সর্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ (স্বর্ণ) মুদ্রা। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাংলাদেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কি?

সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত এবং তাহার বদলে দেশে প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হইত—এই সুবর্ণ রোমক দিনার এবং রৌপ্য রোমক দ্রহ্ম হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব শতক হইতেই এই সমৃদ্ধির সূচনা দেখা দিয়াছিল এবং সমানে চলিয়াছিল প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত কিন্তু তারপরেই এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য-স্রোতে যেন ভাঁটা পড়িয়া গেল। ভারতীয় দ্রব্য সম্ভারের কাছে পশ্চিমের সুবিস্তৃত হাট বন্ধ হইয়া গেল। যখন আবার সেই হাট খুলিল তখন বাণিজ্যকর্তৃত্ব চলিয়া গিয়াছে আরব বণিকদের হাতে এবং সেই

হাটের চেহারাও বদলাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের বাজারে যে সব জিনিসের চাহিদা ছিল তাহাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অন্তত এই সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যে বাংলাদেশের যে অংশ ছিল তাহা যে খর্ব হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের প্রাচীন বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত ; সেই তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ ও ই-ৎসিঙ তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না। চতুর্দশ শতকে ভাগীরথী তীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পূর্ব-দক্ষিণতম বাংলায় নূতন এক বন্দর চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে।

যাহাই হউক অষ্টম শতক ও তাহার পর হইতেই ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশের আর কোনও বিশেষ স্থান ছিল না এবং আন্তর্বাণিজ্যে অল্পবিস্তর আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও সেই হেতু বণিককুল ও ব্যবসায়ীদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নাই। অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে—বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে এবং কৃষকেরাই সমাজদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে।

পাঠ অনুসরণী ও পাঠ-সহায়

বিষয় পরিচিতি : প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল সমৃদ্ধ। এখানকার শিল্পজাত ও ভূমিজাত দ্রব্যাদি ছিল বাণিজ্যের উপকরণ। ফলমূল গ্রামান্তরের হাটে বিক্রয় হত। ভূমিজাত দ্রব্যের মধ্যে পান, সুপারী ও নারকেল ইত্যাদির ব্যবসা বিস্তৃততর ছিল। বংশীদাসের মনসামঙ্গল ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় বাঙালী ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ ভারতের গুজরাটে পান, নারকেল ও সুপারী সমুদ্রোপকূল বেয়ে নিয়ে যেত। বিনিময়ে তারা আনত মাণিক্য, মরকত ও শঙ্খ। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ নিয়ে আসত। তেজপাতা ও পিপ্পলের ব্যবসা ছিল লাভজনক। এখানকার রেশম ও কার্পাস জাতীয় বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বয়ে নিয়ে যেত। তার বার্ষিক মূল্য ছিল আনুমানিক এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। সপ্তম শতক পর্যন্ত বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত। পরবর্তীকালে সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বন্দর গড়ে ওঠে। অষ্টম শতকের পর থেকে বাংলার বাণিজ্যিক গৌরব লুপ্ত হতে থাকে এবং কৃষি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

লেখক পরিচিতি ঃ প্রসিদ্ধ বাঙালী ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস', 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অল্প কয়েক বছর আগে তিনি পরলোক গমন করেন।

শব্দার্থ ঃ ভূমিজাত—মাটিতে জন্মায় এমন। উপকরণ—সামগ্রী। মৎস্য—মাছ। যথেষ্ট—অপর্যাপ্ত। অন্তর্বাণিজ্য—দেশের ভেতরে বাণিজ্য। নিশ্চয়ই—অবশ্যই। প্রতিবেশী—কাছাকাছি বসবাসকারী। একচেটিয়া—একক ভাবে ব্যবসায় আধিপত্য। বণিক—সওদাগর। বহির্বাণিজ্য—স্বদেশের বাইরে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা। সম্ভার—সম্পদ। পিপ্পল—পিপুল। রপ্তানী—অন্যদেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পণ্য সামগ্রী প্রেরণ। সুপ্রাচীন—অতিপ্রাচীন। অনবরত—একটানা। সমৃদ্ধি—উন্নতি। সুসমৃদ্ধ—অতিশয় উন্নত। বন্দর—জাহাজঘাটা। প্রতিপত্তি—প্রাধান্য।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রাচীনকালে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চলত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রাচীন বাংলাদেশের বন্দরগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **প্রসঙ্গ উল্লেখ.........যথেষ্ট অর্থাগম হইত**

(ক) কোন্ প্রসঙ্গ? (খ) কিভাবে যথেষ্ট অর্থাগম হত?

২। **'লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে।**

—কি কথা বলা চলে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। গুজরাট পর্যন্ত বাঙালী বণিকদের বাণিজ্য সম্ভার বয়ে নিয়ে যাবার উল্লেখ কোথায় মেলে?

২। তাম্রলিপ্তর সমৃদ্ধির বর্ণনা কোন্ কোন্ বিদেশী পর্যটক করেছেন।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর** ঃ দ্রব্যাদি, গ্রামান্তরে, যথেষ্ট, অর্থাগম, অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য, উল্লেখ।

২। **বিপরীত শব্দ লেখ** ঃ নগর, রপ্তানী, অন্তর্বাণিজ্য, সন্দেহ, প্রতিবেশী, কম, সমৃদ্ধি।

৩। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** গ্রাম, বাণিজ্য, প্রাচীন, বাঙালী, ব্যবসা, বার্ষিক, জাহাজ, রাষ্ট্র।

৪। **এক কথায় প্রকাশ কর ঃ** ভূমিতে জাত, শিল্পের দ্বারা জাত, কর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন, অন্য গ্রাম, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য।

মৌখিক প্রশ্ন

১। প্রাচীন বাংলার তিনজন রাজকর্মচারীর নামোল্লেখ কর ?

২। গুবাক কার প্রাচীন নাম ?

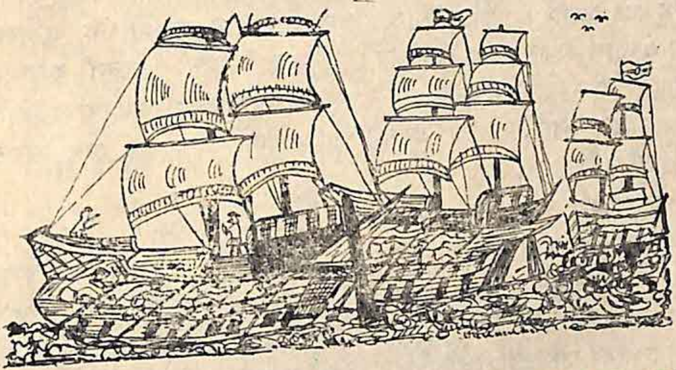
৩। গুজরাট ভারতের কোন্ প্রান্তে অবস্থিত ?

৪। দিনার কি ?

৫। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম কি রচনা করেছেন ?

৬। প্রাচীন বাংলার তিনটি সমৃদ্ধ বন্দরের নামোল্লেখ কর।

আমেরিকা আবিষ্কার



মহাদেশের নাম ইউরোপ। দেশের নাম ইতালী। সমুদ্রের নাম ভূমধ্য-সাগর। বন্দরের নাম জেনোয়া। জেনোয়া শহরের এক তাঁতীর তিন ছেলে—ক্রিস্টফার কলম্বাস, বার্থোলমিউ এবং দিয়িগো। রোজ বিকেলে ছেলেরা বেড়াতে যায় সমুদ্রের ধারে। দেখে, কোন্ অজানা দেশ থেকে সাদা পালতোলা নৌকাগুলো ভেসে আসে, আবার কোন্ অনির্দেশের পথে চলে যায়। অবাক বিস্ময়ে ভাবে আর পুলকিত হয়; তীর ছেড়ে তরী যখন নীলাম্বুরাশির বুকে হারিয়ে যায় তখন তার সঙ্গে শিশুমনও ছুটে চলে দূর দিগন্তের পানে। সবচেয়ে কৌতূহল কলম্বাসের, নাবিকদের পেলেই সে নানাদেশের খবর নেয়—জানতে চায় সাগরের ওপারে কি আছে?

খুব ভাল ছাত্র নয় কলম্বাস। তবে হাতের লেখা ভারী চমৎকার—আর ছবি আঁকায় পটু। আশৈশব সাধ তার নাবিক হবার। ইউরোপের লোকের কাছে তখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা অজানা ছিল। মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী সমতল কাগজের মত চারকোণা। ক্রমে বিজ্ঞানীরা প্রচার করলেন পৃথিবী গোলাকার। তখন ইউরোপের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল, তাহলে পশ্চিমমুখে যাত্রা করে আটলাণ্টিক পেরিয়ে যেতে পারলে নিশ্চয়ই এশিয়ায় গিয়ে পৌঁছানো যাবে। যুবক কলম্বাস স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন সাগর পারের সেই দেশে পৌঁছে গেছেন। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র তাকে বার বার হাতছানি দেয়। অচেনার আহ্বান যার কানে বাজে, জলধির কল্লোল যার অন্তরে দোলা দেয়, মহতের সংকেত আর আদর্শের স্বপ্নে যে বিভোর, মাটি আর ঘর তাকে ধরে রাখতে পারে না।

পর্তুগাল ছিল তখন নৌবিদ্যাচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র। কলম্বাস পর্তুগালে গিয়ে লিসবনের এক ধনী মহিলাকে বিবাহ করলেন। এই সূত্রে তিনি দেশের

অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেখানকার নৌবিদ্যাশিক্ষার কলেজে ভূগোল ও সমুদ্রাভিযান সম্বন্ধে যে সব গবেষণা চলছিল তা তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। ফাঁকে ফাঁকে নিজের ঘরে বসে আটলাণ্টিক অভিযানের প্ল্যান ও ম্যাপ তৈরী করতে লাগলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী টসানেলী কলম্বাসকে উৎসাহ দিলেন—বললেন তুমি যদি এখান থেকে সোজা পশ্চিমমুখো আটলাণ্টিক পেরিয়ে যেতে পার, তাহলে অবশ্যই সোনাদানা, মণিমুক্তার দেশ ভারতবর্ষ অথবা চীনে গিয়ে পেঁছতে পারবে।

পর্তুগালের রাজা জন কলম্বাসের প্রস্তাব শুনলেন। কিন্তু তিনি কলম্বাসকে বাদ দিয়ে একদল নাবিককে সমুদ্রাভিযানে পাঠালেন। কিছুদূর গিয়ে তারা হতাশ হয়ে ফিরে আসে। এ খবর পেয়ে কলম্বাস ঘৃণায় পর্তুগাল ত্যাগ করলেন। ইতালী, ইংলণ্ড সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে সাহস ভরে তিনি স্পেনের রাণী ইসাবেলার সঙ্গে দেখা করলেন। ইসাবেলা দয়াবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। প্রথমটা রাণী ইসাবেলা ইতস্তত করছিলেন। শেষ পর্যন্ত এক মঠাধ্যক্ষের মধ্যস্থতায় স্পেনের রাজা ও রাণী কলম্বাসকে তার অভিযানে সাহায্য করতে রাজী হলেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী মারা গেছেন—তাই একমাত্র পুত্রকে রাণী ইসাবেলার হাতে সমর্পণ করে কলম্বাস যাত্রার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। প্যালোসের বন্দরে তিনটি জাহাজ কেনা হল—সাণ্টামেরিয়া, পিণ্টা ও নিনা। সবচেয়ে বড় জাহাজটির দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৬৩ ফুট। অনেক খুঁজে পেতে মোট ১২০ জন লোক নিয়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট কলম্বাস প্যালোস বন্দর থেকে শুভযাত্রা করলেন।

দুই একদিন পর থেকেই গণ্ডগোল সুরু হল। পিণ্টা জাহাজটি বিগড়ে গেল। পর্তুগালের রাজা কলম্বাসের এই অভিযানে বাধা দেবার জন্য একদল সৈন্য সহ একটি জাহাজকে পাঠালেন। খবর পেয়ে কলম্বাস আর পিণ্টার জন্য অপেক্ষা করতে ভরসা পেলেন না। ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি সেই ভগ্নদেহ পিণ্টাকে নিয়েই অকাল দরিয়ার বুকে ঢুকে পড়লেন। ক্রমে ছেড়ে আসা তটের রেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুদিন পরে সমুদ্রের শান্ত বায়ু ঝড়ে পরিণত হল। মজার ব্যাপার এই যে ঝড় আর তরঙ্গের শেষ নেই—তাদের থামবার নাম নেই। ব্যাপার দেখে কলম্বাসের সঙ্গীরা তাকে ফেরবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। তিনি তাদের ধনসম্পদ, মণিমাণিক্য, সোনাদানার প্রলোভন দেখিয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা করলেন। সামুদ্রিক কুয়াশার সময় কলম্বাসের সন্দেহ হত অন্য জাহাজগুলো হয়ত মুখ ঘুরিয়ে দেশের দিকে ফিরে যাচ্ছে। নাবিকদের আচার আচরণ, কথাবার্তায় তার মনে সন্দেহ দৃঢ়মূল হতে লাগল যে—তারা যে কোন মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে পারে। একদিকে ভয়ঙ্করী প্রকৃতি অন্য দিকে তার অনিচ্ছুক সঙ্গী ও নাবিকেরা—এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে কলম্বাস প্রতিমুহূর্তে

বিপদের আশংকা করছেন। একদিন সমুদ্রের বুকে এক ভাঙা মাস্তুল ভেসে আসতে দেখে নাবিকদের মনে খানিকটা আশার আলো দেখা দিল। খানিকদূর এগিয়ে সমুদ্রের বুকে এক বিরাট ঘন আগাছার বন ভেসে আসতে দেখা গেল। নাবিকদের মনে ভয় আর ভরসার দোলা। একদিন তিনটি পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে জাহাজের মাস্তুলে দু'দিন বসে থেকে গান গাইতে লাগল। অভিযাত্রীদের মনে আশার সোনালী কিরণ চক্‌চক্‌ করে। হঠাৎ একদিন আকাশ কালো হয়ে এল, শান্ত সমুদ্র গর্জন করতে লাগল ভীমবেগে। জাহাজে মাত্র কয়দিনের খাদ্য জমা আছে। ১১৯ জন নাবিক এবার সত্যি বিদ্রোহ করে উঠল। তারা কলম্বাসকে সমুদ্রে ফেলে দেবে স্থির করলো। কলম্বাস অকুতোভয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন। কলম্বাস বোঝালেন—আমাকে ফেলে চলে গেলে নির্ঘাত প্রাণদণ্ড। রাজা তোমাদের ক্ষমা করবে না। ধরে নাও সামনে মৃত্যু আর পিছনেও মৃত্যু। এমন সময় পিণ্টা থেকে সংবাদ ভেসে এল—মাটি, মাটি, মাটি। আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু না, ওটা বাষ্পীয় মেঘ। তা হোক—কলম্বাস বললেন, যে প্রথম সত্যি মাটি দেখতে পাবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে আরও কিছুদিন গেল। আশা গেল হতাশায় মিলিয়ে। এবার অসন্তুষ্ট নাবিকেরা ঘেরাও করল ক্যাপটেনকে। "হয় জাহাজের মুখ ফেরাও নতুবা নতুন ক্যাপটেন ঠিক করে আমরা দেশে ফিরব"। ক্যাপটেনের একই উত্তর—তীরে না পেঁছে তিনি ফিরবেন না। আর বন্ধুদের কাছ থেকে মাত্র তিনদিন সময় চেয়ে নিলেন।

কলম্বাসের কাতর আবেদন যেন ঈশ্বরের কানে পেঁছিল। তৃতীয় দিন সকালে কলম্বাস একটি গাছের ডাল ভেসে আসতে দেখলেন। তাতে কালজামের মত এক প্রকার ফল লেগে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত।—কি আশ্চর্য, আলো না। হ্যাঁ আলোই তো? কলম্বাস দেখলেন আলো—২৪০ টি চোখ দেখল আলো। তবু বিশ্বাস হয় না। ভালো করে চোখ রগড়ে আবার দেখল—আলো জ্বলছে, আবার নিভছে। পাথরের মানুষগুলো পাথরের মতো চোখ নিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই আশার আলোর পানে। একসময় পিণ্টা থেকে সাণ্টামেরিয়াতে খবর এল দূরে তটরেখা দেখা যাচ্ছে। ক্যাপটেন তার দূরবীন দিয়ে দেখলেন হ্যাঁ সামনে বহু আকাঙ্ক্ষিত তটভূমি। আনন্দে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মাটি, মাটি, মাটি।

১২ই অক্টোবর ১৪৯২ খৃঃ কলম্বাস প্রথম ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে সেই নবাবিষ্কৃত দেশের মাটিতে পুঁতে দিলেন। কলম্বাসের তখনও ধারণা ছিল তিনি ইণ্ডিয়ার মাটিতে নেমেছেন। সেই অধিবাসীরা রেড-ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত।

নিরলস সাধনা অক্লান্ত চেষ্টা ও দুঃসাহসিক মনোবল, ধৈর্য, ত্যাগ ও

তিতিক্ষার ফল মিলল হাতে হাতে ; সমুদ্রজয়ী কলম্বাস নূতন জগতের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিলেন বিশ্বের মানব জাতির সম্মুখে। প্রমাণ হল পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই—মানুষ অমর নয়—কিন্তু অপরাজেয়।

পাঠ অনুসরণী ও পঠি-সহায়

বিষয় পরিচিতি ঃ ভূমধ্য সাগরের উপকূলে ইতালীর জেনোয়া শহরে কলম্বাসের জন্মস্থান। আশৈশব তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় নাবিক হবার। তখন ইউরোপের বহু লোকের ধারণা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পার হলে এশিয়াতে পৌঁছান যাবে। পর্তুগাল তখন ছিল নৌ বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র। তিনি সেখানকার লিসবন শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি নৌ-অভিযানের প্রস্তাব দিয়ে পর্তুগালের রাজার সাহায্য বঞ্চিত হন। পরে তিনি স্পেনের রাণী ইসাবেলার সাহায্যে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের জন্য বার হন। দীর্ঘদিন সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে তাঁর সহচর নাবিকেরা অস্থির হয়ে ওঠেন। তাতে কলম্বাসের জীবন বিপন্ন হবার আশংকা দেখা দেয়। দীর্ঘ জলপথ পরিক্রমার পরে অবশেষে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তিনি নতুন দেশ আবিষ্কার করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতেই পৌঁচেছেন। সেই অধিবাসীরা রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। এমনিভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী নাবিক কলম্বাস সভ্য জগতের নিকটে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন।

শব্দার্থ ঃ মহাদেশ—অনেকগুলি দেশের সমষ্টি। অনির্দেশ—অনির্দিষ্ট। পুলকিত—আনন্দিত। তরী—নৌকা। কৌতূহল—অনুসন্ধিৎসা। নীলাম্বুরাশি—নীল রঙের জলস্রোত। নাবিক—নৌ-অভিযাত্রী। নিশ্চয়ই—অবশ্যই। হাতছানি—হাত আন্দোলিত করে আহ্বান। জলধি—সমুদ্র। আয়ত্ত—বশ। সমুদ্রাভিযান—সমুদ্রপথ ধরে গিয়ে কোন অজানা দেশ আবিষ্কার। প্রত্যাখাত—বিমুখ। অকূল দরিয়ায়—বিশাল সমুদ্রে। অদৃশ্য—দেখতে না পাওয়া। বিদ্রোহ—বিরুদ্ধা চারণ। সোনালী—সোনার মত রং। চকচকে—উজ্জ্বল। অকুতোভয়ে—নির্ভিক চিত্তে। সম্মুখের—সামনের। নির্ঘাত—সুনিশ্চিত। প্রাণদণ্ড—শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুর বিধান। অসন্তুষ্ট—অখুশী। হতাশা—আশাহীনতা। উদগ্রীব—উৎসুক, ব্যাকুল। আকাঙ্ক্ষিত—অভিপ্রেত। তটভূমি—তীর, উপকূল। অসম্ভব—অসাধ্য।

অনুশীলনী

বর্ণনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। কলম্বাস কেন পর্তুগালে যান ? পরে তিনি পর্তুগাল ছেড়ে গেছলেন কেন ?

২। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। **পৃথিবীতে অসম্ভব......কিন্তু অপরাজেয়।**

(ক) কোন্ প্রবন্ধের অংশ ? (খ) অমর কে ? (গ) কেনই-বা মানুষকে অপরাজেয় বলা হয়েছে ?

উদ্ধৃতিমূলক প্রশ্ন

১। **হয় জাহাজের মুখ......দেশে ফিরব।**

(ক) কারা, কখন ও কাকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলেছিল ? (খ) এরূপ উক্তির কারণ কি ?

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১। **পদ পরিবর্তন কর ঃ** মহাদেশ, ইউরোপ, বিস্ময়, পুলকিত, বিশ্বাস, স্বপ্ন, ধনী, প্রস্তাব।

২। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** নাবিক, নীলাম্বুরাশি, সমুদ্রাভিযান, নিরলস, মনোবল।

৩। **বিপরীত শব্দ লেখ ঃ** মাটি, অমর, মানুষ, প্রমাণ, বন্ধু, ঠান্ডা, অদৃশ্য।

৪। **বাক্য গঠন কর ঃ** আশৈশব, কৌতূহল, সমতল, অভিযান, প্রত্যাখ্যাত, গণ্ডগোল, ধনসম্পদ, দৃঢ়মূল, অকুতোভয়ে।

৫। **লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ** রাজা, স্ত্রী, ছাত্র, মঠাধ্যক্ষ, ভয়ংকরী, সঙ্গী।

মৌখিক প্রশ্ন

১। কলম্বাসের পুরো নাম কি ?

২। কলম্বাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

৩। লিসবন শহর কোন্ দেশে অবস্থিত ?

৪। পৃথিবীর দুটি মহাদেশের নাম কর।

৫। পৃথিবীর দুটি মহাসাগরের নাম কর।

৬। কলম্বাস যে জাহাজগুলি চড়ে নৌ-অভিযানে যান সেগুলির নাম কি কি ?

৭। নাবিক কাকে বলে ?

৮। ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত তিনটে দেশের নাম কর।